ব্যবসায় পরিচিতি

নবম-দশম শ্রেণী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
ঢাকা

প্রথম অধ্যায়

ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি
Definition and Nature of Business

১.১ ব্যবসায় কী (What is Business)

ব্যবসায় একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। সম্পদ ব্যবহার করে যখন কোনো কাজ করা হয় তখন সেটিকে অর্থনৈতিক কাজ বলে। এ অর্থনৈতিক কাজ যখন মুনাফা অর্জনের জন্য করা হয় তখন তা হয় ব্যবসায়।

'ব্যবসায়' শব্দটি ইংরেজি 'Business' শব্দের পারিভাষিক প্রতিশব্দ। 'Business' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'ব্যস্ত থাকা'। ব্যবসায়ী মুনাফার উদ্দেশ্যে নিয়তই ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্নের কাজে ব্যস্ত থাকে। তাই বলা যায়, যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে যে লেনদেন সম্পন্নের কাজে ব্যাপৃত থাকে তাকেই ব্যবসায় বলে। ছোটখাটো ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে বৃহৎ শিল্পপতি পর্যন্ত ব্যবসায়িক লেনদেনে নিয়োজিত থেকে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে। মুনাফার উদ্দেশ্যে একজন কৃষক যখন চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন করে অথবা ব্যবসায়ী যখন পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদান বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন বুঝতে হবে তাদের প্রত্যেকেই ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছে। অনুরূপভাবে শিল্পপতি যখন লক্ষ -কোটি টাকা বিনিয়োগ করে পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করে অথবা কোনো পরিবহণ কোম্পানি যখন নিয়মিতভাবে যাত্রী সাধারণ ও পণ্যদ্রব্য আনা-নেওয়া করে তখনও বুঝতে হবে তাদের প্রত্যেকেই ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়েছে।

অতএব মুনাফার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সব রকম উৎপাদন, বণ্টন ও উৎপাদন-বণ্টনের সহায়ক কার্যাবলিকে ব্যবসায় বলে। তাহলে বলা যায় যে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য হল (১) পণ্য ও সেবা উৎপাদন (২) পণ্য ও সেবা বণ্টন এবং (৩) এ প্রকার উৎপাদন ও বণ্টনের সহায়ক কার্যকলাপ সম্পাদন করা।

যাহোক, বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে ব্যবসায়ের সংজ্ঞা নিরূপণের প্রয়াস পেয়েছেন। আর, ডাব্লিউ, ববসন মুনাফার উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য, সেবাকর্ম ও ভাবধারা সৃষ্টি বা উৎপাদন ও বণ্টনের সঙ্গে জড়িত কার্যাবলিকে ব্যবসায় বলে বর্ণনা করেছেন। এল, এইচ, হ্যানির মতে, প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদগুলোর মধ্যে থেকে দরকারি দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহকরণ, শ্রম ও যন্ত্রপাতির দ্বারা সেগুলোকে রূপান্তরকরণ, ভবিষ্যতের জন্য মজুতকরণ, বীমাকরণ এবং মূল্যের বিনিময়ে পণ্যদ্রব্যাদি ভোক্তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়াকে ব্যবসায় বলে।

সুতরাং, ব্যবসায় হচ্ছে মুনাফার উদ্দেশ্যে সম্পদ সংগ্রহকরণ, পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্মাদি উৎপাদন ও বণ্টন এবং একই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সব রকম উৎপাদন ও বণ্টনের সহায়ক কার্যকলাপ। যেমন-পরিবহণ, ব্যাংকিং, বীমা, প্রত্যক্ষ সেবামূলক ও পেশাদারী কার্যকলাপ।

১.২ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যাবলি (Objectives of Business)

অর্থ বা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। বলা যায়, মুনাফা অর্জনই ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এ ছাড়া ব্যবসায়ী বহুবিধ সামাজিক, মানবিক ও জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। সবদিক বিবেচনা করে আমরা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যাবলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন-

(ক) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য
(খ) সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্য এবং
(গ) জাতীয় উদ্দেশ্য

ক. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য : অর্থ উপার্জন, মূলধন খাটানো, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ইত্যাদি ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্গত। নিচে এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

১। মুনাফা অর্জন : অর্থ বা মুনাফা উপার্জন ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়েই মানুষ ব্যবসায়ে রত হয়। সব রকম উৎপাদন, বণ্টন ও এগুলোর সহায়ক কার্যাবলির উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা। তাই মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য বিবর্জিত কোনো কাজ ব্যবসায়ের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন, মা তার শিশু সন্তানের জন্য জামা-কাপড় তৈরি করলে তা ব্যবসায় হবে না। কিন্তু, দর্জির সেলাই ও রিফু কর্মাদি ব্যবসায়ের অন্তর্গত; কারণ, এ কাজে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য রয়েছে।

২। মূলধন খাটানো : পুঁজি বা মূলধনের সদ্ব্যবহারের জন্য মানুষ ব্যবসায়ে রত হয়। সঞ্চিত অর্থ মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হলে উৎপাদন, বণ্টন ও অন্যান্য ব্যবসায়িক কার্য সম্প্রসারিত হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

৩। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার : প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে জনকল্যাণে নিয়োজিত করা ব্যবসায়ের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। জল, স্থল ও পাতালে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ছড়িয়ে রয়েছে। এসব সম্পদ সংগ্রহকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনের মাধ্যমে এগুলোকে জনগণের সেবায় লাগানোর জন্য ব্যবসায় গঠন করা হয়।

৪। জনশক্তির সদ্ব্যবহার : জনশক্তি ব্যবসায়ের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। জনশক্তিকে উৎপাদনক্ষম কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উৎপাদন ও বণ্টনের বিবিধ ক্ষেত্রে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় যেখানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা ব্যবহার করতে পারে। এভাবে ব্যবসায় একটি দেশের জনশক্তির সদ্ব্যবহার করে থাকে।

৫। উদ্ভাবন : গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন নতুন পণ্যসম্ভার ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টি করা ব্যবসায়ের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থার ফলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ব্যবসায়ীর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়। ভোক্তারা নতুন নতুন পণ্য ও সেবা ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়। সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকশিত হয়।

খ। সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্যাবলি : অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলি ছাড়াও ব্যবসায়ের কতকগুলো মূল্যবান সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্য থাকে। নিচে এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১। উন্নত পণ্য ও সেবা সরবরাহ : মানুষের অভাব মোচন ও ভোগ-বিলাসের জন্য উন্নত উপকরণাদি সরবরাহ করা ব্যবসায়ের একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উদ্দেশ্য। প্রকৃত ব্যবসায়ী জনগণের জন্য খাঁটি ও উন্নত পণ্যদ্রব্য ও সেবা সরবরাহ করে তাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। জনগণ আহার, বাসস্থান ও পরিধান এবং ভোগ-বাসনা-তৃপ্তির উন্নত উপকরণাদি পেয়ে কৃতার্থ হয়। এভাবে সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধিত হয়।

২। অতিমুনাফাখোরি ও অসামাজিক তৎপরতা বর্জন : কালোবাজারি, অতিমুনাফাখোরি, মজুতদারি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হতে দূরে থেকে ব্যবসায় করাই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য। যে কোনো ধরনের অবৈধ, বে-আইনি ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ প্রকৃত ব্যবসায়ের সংজ্ঞা ও নীতির মধ্যে পড়ে না।

৩। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন : সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে। অর্থ উপার্জন এবং সমাজসেবামূলক কাজে অর্থব্যয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করতে চায়। অনেকে এ উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৪। বেকারত্ব দূরীকরণ : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূর করা ব্যবসায়ের একটি সামাজিক ও মানবিক উদ্দেশ্য। বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে ব্যবসায় দেশে দেশে বেকারত্ব দূর করে।

৫। মানবীয় সুসম্পর্কের উন্নয়ন : আধুনিক যুগে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মানবীয় সম্পর্কের ওপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিল্প ক্ষেত্রে সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক শিল্পোন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পরিস্থিতি মালিক ও মজুর এবং জনগণের কল্যাণের সহায়ক।

গ। জাতীয় উদ্দেশ্যাবলি : ব্যবসায়ের জাতীয় উদ্দেশ্য সামাজিক উদ্দেশ্যাবলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। একটি দেশের ব্যবসায়ীরা অবশ্যই জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও জাতীয় উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। সর্বপ্রকার কর ও শুল্ক পরিশোধের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি আনয়নই হবে প্রতিটি ব্যবসায়ীর লক্ষ্য। তাদের সৎ কারবারি তৎপরতা দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটাবে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ। হ্রাস পাবে বেকারত্ব। জনগণের আয় ও জীবন মান বেড়ে চলবে। দেশ ও জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হবে।

১.৩ ব্যবসায়ের কার্যাবলি (Functions of Business)

মানুষের অভাব পূরণের সামগ্রী সরবরাহের জন্য সকল প্রকার অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদিত হয়। এর মধ্যে যে সব অর্থনৈতিক কাজ অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয় সেগুলো হচ্ছে ব্যবসায়িক কাজ। এগুলো সম্পদ আহরণ, উৎপাদন, বণ্টন ও আনুষঙ্গিক কাজের সঙ্গে জড়িত। নিচে ব্যবসায়িক কার্যাবলির বর্ণনা দেয়া হল :

১। উৎপাদন : উৎপাদন ব্যবসায়ের মূখ্য কাজ। শিল্পের সাহায্যে প্রকৃতি প্রদত্ত পদার্থের রূপগত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয়। যেমন, তুলা থেকে সুতা, সুতা থেকে কাপড় বা গম থেকে ময়দা তৈরি করা বা কাঠ থেকে আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরি হয়। সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিকাজ প্রভৃতি উৎপাদন কার্যাবলির অন্তর্গত।

২। ক্রয়-বিক্রয় : পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের বা এগুলোর মালিকানা এক ব্যক্তির কাছ থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থানান্তর করলে স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। এ প্রকার কাজের দ্বারা পণ্যদ্রব্যের স্বত্ব বা মালিকানা পরিবর্তন করা হয়। ব্যবসায়ী বা বণিকরা পুনঃবিক্রয়ের নিমিত্তে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে থাকে। উৎপাদনের জন্য ব্যবসায়ী কাঁচামাল ক্রয় করে এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে। উভয় ক্ষেত্রেই মালিকানা পরিবর্তন হয় ও স্বত্ব হতে উপযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. অর্থসংস্থান : ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় অর্থ বা তহবিলের প্রবাহ বজায় রাখা হল অর্থসংস্থান। বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা স্থায়ী সম্পদ অর্জন ও চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা হয়।

৪। পরিবহণ : পরিবহণ পণ্যদ্রব্যের প্রতিবন্ধকতা দূর করে পণ্যদ্রব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ফলে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়। পরিবহণের সাহায্যেই ব্যবসায়ীরা দেশ-বিদেশের নানা স্থানে পণ্য সামগ্রী নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

৫। গুদামজাতকরণ : গুদামজাতকরণ এমন ব্যবসায়িক কাজ যার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করে এগুলোর সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য এক সময় থেকে অন্য সময়ে ব্যবহারের জন্যও সংরক্ষণ করা হয়। এর ফলে ভোক্তারা বিভিন্ন সময়ে এবং ঘাটতি মৌসুমে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রবাদির সরবরাহ পেয়ে উপকৃত হয়।

৬। বীমা : বীমা লেনদেনের ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। ভবিষ্যৎ সর্বদাই অনিশ্চিত। এ কারণেই লেনদেনে ঝুঁকিগত উপাদান বিদ্যমান। অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি, মূল্যহ্রাস ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ী বিপুল ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে এরূপ ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ীর কোনো ক্ষতি হলে বীমাকারী কর্তৃক তা পূরণ করা হয়।

৭। বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপন এটি পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা বা ভোক্তাদের জ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে ব্যবসায় প্রসারে সাহায্য করে। এর সাহায্যে বাজারে পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা হয় ফলে বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞাপন সুচারুরূপে সম্পন্নের জন্য প্রত্যেক দেশেই অনেক বিজ্ঞাপন ফার্ম গড়ে উঠেছে।

৮। পর্যায়িতকরণ ও প্রমিতকরণ : পণ্যকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী সাজানো যেমন- আমকে বড়, মাঝারি ও ছোট ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিক্ত করা হল পর্যায়িতকরণ। বিক্রয়ের সুবিধার্থে অনেক সময় পণ্যাদি সাইজ বা মান অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়, যা পর্যায়িতকরণ বা Grading নামে পরিচিত। অন্যদিকে পণ্যের মান নির্দিষ্টকরণকে প্রমিতকরণ বলে। যেমন, বিভিন্নমানের সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি করা হয়, যেমন-৪০ কাউন্টের সুতা, ৮০ কাউন্টের সুতা ইত্যাদি।

৯। প্যাকিং : পরিবহণের সুবিধার জন্য পণ্যের যথাযথ সংরক্ষণ ও প্যাকিং বা গাঁটরি করা হয়। আকর্ষণীয় মোড়ক পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। ফলে ব্যবসায়ের প্রসার ও সাফল্য আসে। প্রত্যেক দেশেই প্যাকিং-এর কাজে অনেক বিশেষায়িত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি গড়ে উঠেছে।

১০। ক্রেতা বা ভোক্তা সেবা : ব্যবসায় করার জন্য ক্রেতাসাধারণ ও ভোক্তাদের নানা প্রকার সেবা প্রদান করার দরকার হয়। কেননা এর ফলে ক্রেতা বা ভোক্তাসাধারণ সন্তুষ্ট হয়ে থাকে ও ব্যবসায়ের সাফল্যও নিশ্চিত হয়।

১১। বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন : বাজার গবেষণা ও পণ্য উন্নয়ন অধুনা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কাজে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের কাজ পণ্যের চাহিদা ও বাজার সম্প্রসারণে নতুন পণ্য উদ্ভাবন, ক্রেতার পছন্দ নির্বাচন ও বাজারের অবস্থা জানতে সাহায্য করে।

১২। আনুষঙ্গিক কার্যাবলি : উল্লিখিত কার্যাবলি ছাড়াও ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক অনেক কাজ আছে। যেমন কর্মী নির্বাচন ও উন্নয়ন, হিসাবরক্ষণ, মজুত, সংরক্ষণ প্রভৃতি ব্যবসায়ের আনুষঙ্গিক কার্যাবলির অন্তর্গত।

১.৪ ব্যবসায়ের প্রকারভেদ (Types of Business)

ব্যবসায় বা Business-এর অর্থ ও পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি উৎপাদন, বণ্টন থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যদি তা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়। তাই শিল্প, বাণিজ্য, প্রত্যক্ষ সেবাকর্ম, সহায়ক কার্যাবলি ইত্যাদি সবকিছু মিলেই হয় ব্যবসায়। নিম্নোক্ত ছকে ব্যবসায় ও এর শাখা-প্রশাখা দেখানো হল :
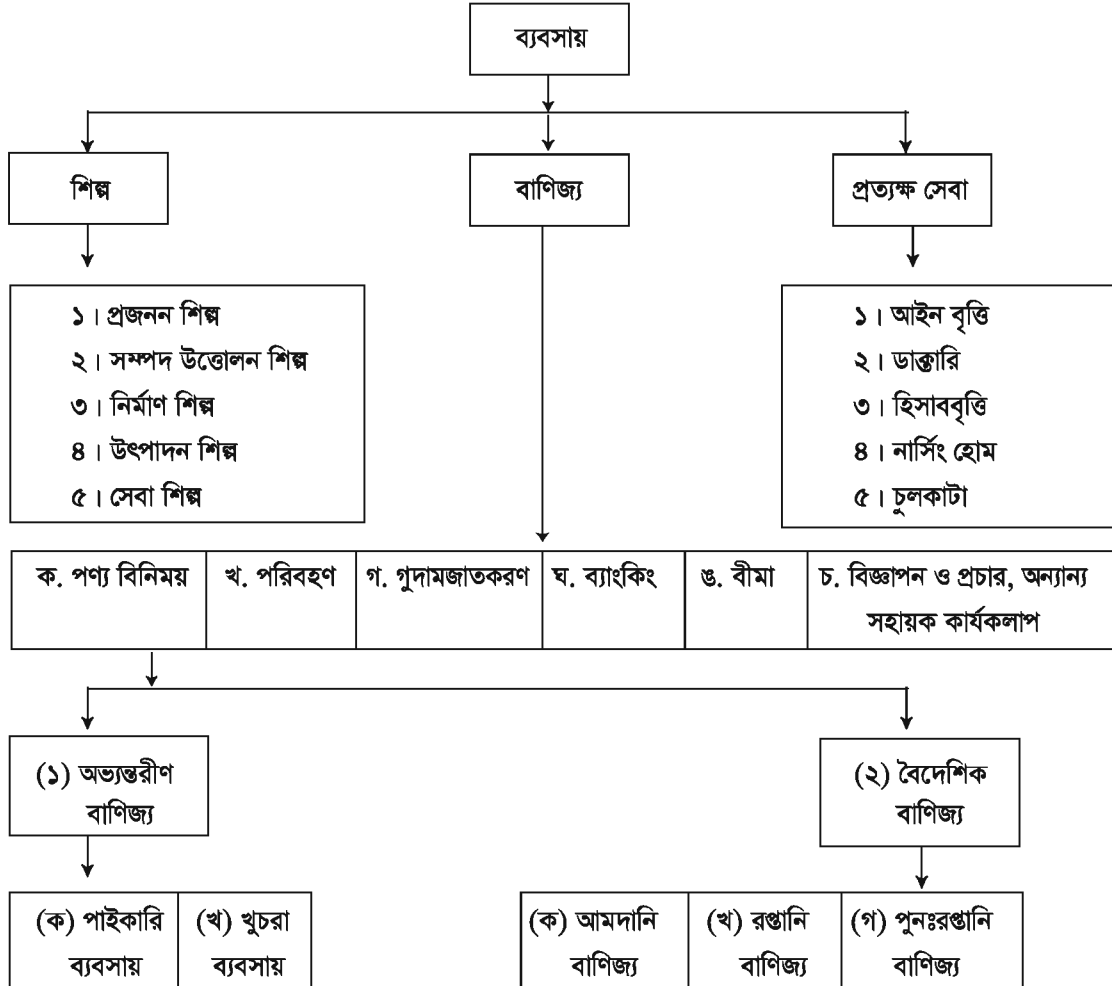
(১) শিল্প (Industry)

শিল্প উৎপাদনের বাহন। শিল্পের মাধ্যমে কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে পরিণত পণ্য তৈরি করা হয়। সমুদয় শিল্পকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- (ক) প্রজনন শিল্প (Genetic Industry) (খ) সম্পদ উত্তোলন শিল্প (Extruction Industry) (গ) নির্মাণ শিল্প (Construction Industry) (ঘ) উৎপাদন শিল্প (Manufacturing Industry) এবং (ঙ) সেবা শিল্প (Service Industry)।

(ক) প্রজনন শিল্প

প্রজনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে শিল্পের বিস্তার ঘটে তাকে প্রজনন শিল্প বলে। যেমন-গাছ-গাছড়ার চারা আবাদ, পশু পালন, হাঁস-মুরগীর চাষ প্রভৃতি প্রজনন শিল্পের অন্তর্গত।

(খ) সম্পদ উত্তোলন শিল্প

ভূগর্ভ থেকে গ্যাস, কয়লা, তৈল, লৌহ প্রভৃতি ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ উত্তোলনের কাজকে বলে সম্পদ উত্তোলন শিল্প।

(গ) নির্মাণ শিল্প

সেতু, বাঁধ, ঘরবাড়ি প্রভৃতির নির্মাণ কার্যাদি নির্মাণ শিল্প বলে পরিচিত।

(ঘ) উৎপাদন শিল্প

কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করে পরিণত পণ্য তৈরি কাজে রত থাকে উৎপাদন শিল্প। যেমন, বস্ত্র শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি।

(ঙ) সেবা শিল্প

গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, বিমান, রেলওয়ে, বাস, হোটেল, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে নিয়োজিত শিল্পগুলোকে বলে সেবা শিল্প।

(২) বাণিজ্য (Commerce)

বাণিজ্য হল ব্যবসায়ের পণ্য বণ্টনকারী শাখা। ক্রেতা বা ভোক্তাদের নিকট পণ্য ও সেবা বণ্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। পণ্য বণ্টনের পথে কতকগুলো প্রতিবন্ধক দেখা যায়। সেগুলো হচ্ছে ব্যক্তিসংক্রান্ত, স্থানগত, সময়গত, ঝুঁকিগত, অর্থসংস্থানজনিত ও জ্ঞানসংক্রান্ত প্রতিবন্ধক। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য যে কাজগুলো করা হয় তাকে বাণিজ্য বলে। নিচে বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন শাখাগুলোর বর্ণনা দেয়া হল :

ক. পণ্য বিনিময় (Trade)

পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বা স্বত্ব হস্তান্তরকে পণ্য বিনিময় বা Trade বলে। পণ্য বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্যের স্বত্ব এক ব্যক্তির কাছে থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্যের স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। পণ্য বিনিময় বা Trade প্রধানত দু'ধরনের, যথা-অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (Home Trade)

দেশের রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে পণ্যদ্রব্যের বিনিময় বা ক্রয়-বিক্রয়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দু'প্রকার, যথা- (১) পাইকারি ব্যবসায় এবং (২) খুচরা ব্যবসায়।

উৎপাদকের নিকট থেকে অধিক পরিমাণে পণ্যসম্ভার ক্রয় করে সেগুলোকে ছোট ছোট 'লটে' ভাগ করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করার প্রক্রিয়াকে পাইকারী ব্যবসায় বলে। এ ব্যবসায়ে জড়িত ব্যবসায়ীদেরকে বলা হয় পাইকার।

অন্যদিকে পাইকারের নিকট থেকে পণ্য সংগ্রহ করে খুচরা মূল্যে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করাকে খুচরা ব্যবসায় বলে এবং এ কাজে নিয়োজিত লোকজনকে খুচরা ব্যবসায়ী বলে। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকার ও ভোক্তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সুবিধা পেলে সে উৎপাদকের কাছ থেকেও পণ্য সংগ্রহ করে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করে।

বৈদেশিক বাণিজ্য (Foreign Trade)

ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। এ ব্যবস্থায় পণ্যদ্রব্য বা সেবাসমূহ এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রেরিত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্য তিন ধরনের, যথা- আমদানি বাণিজ্য, রপ্তানি বাণিজ্য এবং পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য।

যখন এক দেশ অন্য দেশ থেকে পণ্য বা সেবা আনয়ন করে তখন এটি হয় প্রথম দেশের আমদানি বাণিজ্য। যেমন, আমরা যখন বিদেশ থেকে ঔষধ, যন্ত্রপাতি বা শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আনয়ন করি তখন তা হয় আমাদের জন্য আমদানি বাণিজ্য।

স্বদেশ থেকে বিদেশে পণ্য বা সেবা প্রেরিত হলে অর্থাৎ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য বা সেবা প্রেরিত হলে তাকে বলা হয় **রপ্তানি বাণিজ্য**। যেমন, আমরা যখন বিদেশে কাঁচা পাট প্রেরণ করি তখন তা হয় আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য।

যখন কোনো দেশ বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য অন্য কোনো তৃতীয় দেশে প্রেরণ করে তখন তা হয় **পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য**। যেমন, যুক্তরাজ্য বাংলাদেশ থেকে চা আমদানি করে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে সরবরাহ করে। এটি যুক্তরাজ্যের জন্য পুনঃরপ্তানি বাণিজ্য।

খ. পরিবহণ (Transportation)

পরিবহণ এক প্রকার বাণিজ্য। নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে এটি পণ্যদ্রব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তর করে স্থানগত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করে।এর মাধ্যমে তাই পণ্যদ্রব্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ভোগ কেন্দ্রে পণ্য স্থানান্তরের জন্য পরিবহণের দরকার হয়। বিভিন্ন প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা হচ্ছে (১) সড়ক পরিবহণ-বাস, ট্রাক, রিক্সা ইত্যাদি (২) রেল পরিবহণ- যাত্রীবাহী ও মালবাহী রেলগাড়ি (৩) নৌ-পরিবহণ- যাত্রীবাহী জাহাজ, মালবাহী জাহাজ, নৌকা, স্টিমার ইত্যাদি এবং (৪) আকাশ পরিবহণ- বিমান, হেলিকপ্টার ইত্যাদি।

গ. গুদামজাতকরণ (Warehousing)

সময়গত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায় গুদামঘর বা সংরক্ষণাগার। নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে গুদাম ঘরে পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়। অনেক পণ্য বছরের এক সময়ে উৎপাদিত হলেও সারা বছর ধরে ব্যবহার করা হয়। তাই পণ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম ঘরের দরকার হয়। এক সময়ের পণ্য অন্য সময়ে স্থানান্তরিত করে এটি পণ্যের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করে।

ঘ. ব্যাংকিং (Banking)

ব্যাংকব্যবস্থা ব্যবসায়ের অর্থসংস্থানজনিত প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট হারে সুদের বিনিময়ে ঋণ সরবরাহ করে ব্যাংক ব্যবসায়ে অর্থসংস্থান করে থাকে।

ঙ. বীমা (Insurance)

বীমা ব্যবসায়ের ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করে। নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারী বীমাগ্রহীতা ব্যবসায়ীর সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে। অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি, মূল্যহ্রাস প্রভৃতি কোনো কারণে ব্যবসায়ীর কোনো ক্ষতি হলে বীমাকারী তা পূরণ করে। কিন্তু, ক্ষতি না হলে বীমাকারীর কোনো দায়িত্ব থাকে না। বীমার প্রিমিয়াম বীমাকারীর লাভে পরিণত হয়।

চ. বিজ্ঞাপন (Advertisement)

বিজ্ঞাপন পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের জ্ঞানসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সাহায্য করে। এই বিজ্ঞাপন একজন ব্যবসায়ী নিজে সরাসরি দিতে পারে বা বিজ্ঞাপন সংস্থার মাধ্যমে দিতে পারে। নির্ধারিত কমিশনের বিনিময়ে বিজ্ঞাপন সংস্থা ব্যবসায়ীর পণ্য বাজারে প্রচার করে তার চাহিদা বৃদ্ধি করে।

(৩) প্রত্যক্ষ সেবা (Direct Service)

শিল্প, বাণিজ্য ও এগুলোর সহায়ক কার্যাবলি ছাড়াও মুনাফা উপার্জনের উদ্দেশ্যে পেশাদারী বিশেষজ্ঞরা যে সব সেবামূলক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে সেগুলোকে প্রত্যক্ষ সেবা বলা হয়, যেমন-ডাক্তারি, আইনবৃত্তি, চার্টার্ড একাউন্টেন্সি পেশা, হিসাব নিরীক্ষা পেশা ইত্যাদি।

১.৫ ব্যবসায়ের গুরুত্ব (Importance of Business)

আধুনিক বিশ্বে ব্যবসায়ের গুরুত্বের তুলনা মিলে না। একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বিকল্প নেই। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কারণে বহু দেশ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। আবার শিল্প-বাণিজ্যে অনগ্রসর দরিদ্র ও অনুন্নত দেশের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

ব্যবসায়ের গুরুত্বের কারণেই শহর, বন্দর, গ্রাম গঞ্জে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট-বড় দোকান-পাট ও বিশালাকার শিল্পকারখানা। পণ্যদ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদান অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে বিশ্ব বাজারে প্রবেশ করেছে। সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে চলেছে। জনগণের জীবনমান উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে। যাহোক, নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলোতে ব্যবসায়ের গুরুত্বের ধারাবাহিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হল :

১। পণ্য ও সেবা পরিবেশন : ব্যবসায় জনগণের অভাব পূরণের জন্য রকমারি দ্রব্যসম্ভার ও সেবা পরিবেশন করে। জনগণ ব্যবসায়ের কারণে নিত্য-নতুন পণ্যদ্রব্য ও সেবা ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়।

২। সম্পদের সদ্ব্যবহার : শিল্প-বাণিজ্যের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য আহরণ, উৎপাদন ও ভোক্তাদের নিকট বণ্টন করা হয়। এতে জনগণের সেবাকাজে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়।

৩। সঞ্চয় বৃদ্ধি ও পুঁজির সদ্ব্যবহার : ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য মানুষ সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয় এবং উক্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা হয়।

৪। কর্মসংস্থান : ব্যবসায় দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও বেকারত্ব হ্রাস পায়।

৫। উদ্ভাবন : ব্যবসায় গবেষণা ও উদ্ভাবনের উন্নয়ন ঘটায়। এর ফলে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য ও সেবা জনগণের ব্যবহারের জন্য পরিবেশিত হয়।

৬। সহায়ক কার্যাবলির উন্নয়ন : ব্যবসায় পরিবহণ, ব্যাংকিং, বীমা, গুদামজাতকরণ, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রভৃতির উন্নয়ন ঘটায়। আবার, এগুলো ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করে। এতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

৭। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সংস্কৃতির আদান-প্রদান : ব্যবসায়-বাণিজ্য পণ্যদ্রব্যের আন্তর্জাতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি করে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান সম্ভব হয়।

৮। রাজস্ব বৃদ্ধি : পণ্যদ্রব্যের ওপর প্রদত্ত বিক্রয়কর, শুল্ক, ভ্যাট প্রভৃতি সরাসরি রাজস্ব বৃদ্ধি করে, যা পরবর্তীকালে জনকল্যাণে ব্যয়িত হয়।

৯। শহর, বন্দর ও শিক্ষাকেন্দ্রের বিকাশ : ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নকে কেন্দ্র করে অনেক শহর, বন্দর ও শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ব্যবসায় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১০। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি : ব্যবসায়-বাণিজ্য একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হাতিয়ার। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবন-যাত্রার মান উন্নত হয়। সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জিত হয়। তাছাড়া, ব্যবসায় ন্যায্যমূল্যে উন্নত মানের পণ্যদ্রব্য ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে সমাজের জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকে। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা শ্রমিক-কর্মীদের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক ও নানাবিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করে। তারা কালোবাজারি, মজুতদারি প্রভৃতি অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করে। মোট কথা, ব্যবসায় সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এটি একটি দেশ ও জাতির উন্নতির চাবিকাঠি।

১.৬ ব্যবসায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Evolution of Business)

মানুষের অভাব সীমাহীন। রাশি রাশি পণ্যসম্ভার পেয়েও তার অভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে না। মানুষের অভাব মোচনের উপকরণ ও সেবা কার্যাদির সরবরাহকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ের সূচনা হয়। অভিব্যক্তি ঘটে। সভ্যতার শুরু থেকে বিভিন্ন সময়ে কীভাবে ব্যবসায়ের অভিব্যক্তি ঘটে সে সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হল :

ক. আদিম যুগ

মানুষ সভ্য হয়েই পৃথিবীতে আসেনি। প্রথমাবস্থায় সে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ফিরে, গাছের ফলমূল আর পশুপাখির মাংস ভক্ষণ করে দিনাতিপাত করত। পাহাড়-পর্বতের গুহা ছিল তার আবাসভূমি। নিজের উদর পূর্তি করেই সে সন্তুষ্ট থাকত। ব্যবসায় বা তেজারতের কথা তার মনে দানা বাঁধেনি।

পরবর্তীকালে মানুষ পাহাড়-পর্বতের গুহা ও বন-জঙ্গল ছেড়ে নদ-নদী বা হ্রদের উপত্যকায় বসবাস শুরু করে। এ সময় গড়ে ওঠে পরিবার ব্যবস্থা। আস্তে আস্তে কৃষিকাজ ও পশুপালন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। উৎপাদনের কাজ পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ব্যবসায় তখনও শুরু হয়নি।

খ. বিশেষজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ বিনিময়

ক্রমান্বয়ে উৎপাদনের পরিমাণ পরিবারের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে যায়। কর্মক্ষম মানুষ তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর পর অবসরক্ষণটুকু অন্যদের জন্য সেবাদানে ব্যয় করতে আগ্রহী হয়।

এভাবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ হস্তশিল্প (Artisans) গড়ে ওঠে। কামার, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার প্রভৃতি এ ধরনের বিশেষজ্ঞ শিল্পীদের আদিরূপ। তারা তাদের বিশেষজ্ঞ শ্রম দিয়ে বিনিময়ে গ্রহণ করে তাদের দরকারি দ্রব্যাদি। এভাবে শুরু হয় প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থা বা Barter Trade। এ ব্যবস্থায় পণ্যের বদলে পণ্য বিনিময় করা হত।

গ. সংঘ ব্যবস্থা, অর্থের আবির্ভাব (মধ্যযুগ)

হস্তশিল্প ব্যাপকতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতি অগ্রগতি লাভ করে। সূত্রপাত হয় সংঘ ব্যবস্থার। এ ব্যবস্থায় হস্তশিল্পরা সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংঘ গঠন করে। এগুলোর মধ্যে তাঁতী সংঘ, কর্মকার সংঘ, বাসন-শিল্পী সংঘ ইত্যাদি প্রধান। এসব সংঘের পাশাপাশি গড়ে ওঠে অনেক বণিক সংঘ। সংঘ ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও ব্যবসায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু Barter Trade বা দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার কতকগুলো দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যবসায়ের অগ্রগতি দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। পরবর্তীতে বিনিময় ব্যবস্থার বিপত্তিগুলোর প্রতিকারের উপায়স্বরূপ বিনিময়ের সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হিসাবে অর্থের (Money) আবির্ভাব ঘটে। সাধারণ গ্রহণযোগ্যতার ফলে অর্থের বিনিময়ে যে কোনো জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হয়। বিনিময়ের ক্ষেত্রে অর্থের আগমনে ব্যবসায়িক লেনদেন বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। বৃহদায়তন উৎপাদন বা বণ্টন ব্যাপকতর হয়।

ঘ. শিল্পবিপ্লব ও কারখানা ব্যবস্থা (আধুনিক যুগ)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। আবিষ্কৃত হয় স্টিম ইঞ্জিন, স্পিনিং জেনি, পাওয়ার লুম প্রভৃতি এবং আরো অনেক কলকব্জা ও ছোট বড় যন্ত্রপাতি। নিঃসন্দেহে শিল্পবিপ্লব নিয়ে আসে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ পরিবর্তন। লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে বিশালাকার শিল্প কারখানা। এক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত হয় লক্ষ লক্ষ পণ্যদ্রব্য। শিল্পে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত পণ্য স্টিম ইঞ্জিন চালিত জাহাজে করে প্রেরিত হয় দেশ থেকে দেশান্তরে। শিল্প বিপ্লবের ফলে যুক্তরাজ্য ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোতে গড়ে ওঠে বড় বড় শিল্পগোষ্ঠী ও কারখানা ব্যবস্থা।

কারখানা ব্যবস্থার সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেশ–বিদেশের রাজনৈতিক অঙ্গানেও প্রতিফলিত হয়। ব্যবসায় করার অজুহাতে পশ্চিমা ধনিক শ্রেণীর লোকেরা পৃথিবী জুড়ে গড়ে তোলে অসংখ্য উপনিবেশ। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কারখানা ব্যবস্থা ও যান্ত্রিকীকরণের পরিবেশ বিশ্বব্যাপী অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয়তার ব্যাপক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ই-মেইল, উপগ্রহ যোগাযোগ এবং অন্যান্য হাজারো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে বর্তমান উৎপাদন-বণ্টন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে।

১.৭ 'ব্যবসায়' বিষয় পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Studing Business as a Subject)

ব্যবসায় মানুষের অভাব পূরণের সামগ্রী সরবরাহ করে। মানুষ তাই পণ্যদ্রব্য ও সেবা ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে উপকৃত হয়। মধ্যখান থেকে ব্যবসায়ী পণ্যদ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও বণ্টন করে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করে। ব্যবসায়-বাণিজ্য দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। ফলে জনগণের আয় ও জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একজন মানুষের অথবা একটি সমাজ বা জাতির সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ের অবদানের তুলনা মিলে না। এসব কল্যাণকর ব্যবসায়-শিক্ষা আমরা 'ব্যবসায়' বিষয় পাঠে অর্জন করতে পারি। এখানেই আমরা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়টি পাঠের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পাই। ব্যবসায় বিষয়টি ব্যবসায়ের রীতি-নীতি, বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের সংগঠন ও এদের পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে। তাই এ থেকে শিক্ষার্থীরা ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার তত্ত্বমূলক ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভে সক্ষম হবে। এর ফলে বাস্তব জীবনে প্রবেশ করে তাদের পক্ষে সহজেই ছোটখাটো ব্যবসায় গঠন করা সম্ভব হবে। অবশ্য, ব্যবসায়ের তত্ত্বমূলক জ্ঞান ছাড়াই কেউ কেউ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে; কিন্তু, তাতে ব্যবসায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি। এ বিষয়ের জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে নিঃসন্দেহে অধিকতর দক্ষতার সাথে ব্যবসায় চালাতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের গণ্ডি এখন বিশ্ববাজারে পরিব্যাপ্ত। ব্যবসায় শিক্ষা শিক্ষার্থীকে বৈদেশিক বাণিজ্যের রীতি-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে।

আমাদের মত জনবহুল দেশে আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব খুবই বেশি। ব্যবসায় বিষয়টি আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দিতে সক্ষম। কাজেই শিক্ষার্থীরা, বিশেষ করে শিক্ষা জীবনের মাঝপথে যারা শিক্ষা সমাপ্ত করতে বাধ্য হয় সেই সব ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে নিতে সক্ষম হবে। এতে দেশ থেকে বেকারত্ব হ্রাস পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। বৃদ্ধি পাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। তাছাড়া, এ বিষয়ে জ্ঞান তাদেরকে ছোটখাটো কুটির শিল্প গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়াও উন্নতমানের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বেড়ে যাবে, যেগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে স্থান পাবে। তাই বিষয়টি

পাঠ করে ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যবসায়িক যোগাযোগ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভে সক্ষম হবে। ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ব্যবসায় সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের আয়তন ও প্রকৃতি জটিলতর আকার ধারণ করেছে। এ অবস্থায় এ বিষয়ের জ্ঞান একজন ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সমর্থ করবে। তার পক্ষে ন্যূনতম সময়, শক্তি ও অর্থ ব্যয়ে সর্বাধিক সুফল অর্জন করা সম্ভব হবে।

অতএব, ব্যবসায়ের জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যাবশ্যক। এ জ্ঞান তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করবে। এর ফলে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিশেষে ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। শিল্পকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?

ক. ৪ ভাগে　　খ. ৩ ভাগে
গ. ৫ ভাগে　　ঘ. ২ ভাগে

২। প্রতিটি লেনদেনে বিদ্যমান –

i. লাভ
ii. লোকসান
iii. ঝুঁকি

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

৩। জনাব আজীম ভারত থেকে চাল আমদানি করে দেশে প্যাকেটজাত করে মায়ানমারে রপ্তানি করেন। মায়ানমার থেকে তিনি আপেল, কমলা জাতীয় ফলসামগ্রী আমদানি করে দেশে বাজারজাত করেন।

জনাব আজীম কোন ধরণের বাণিজ্যের সাথে জড়িত ?

ক. উৎপাদন, বণ্টন, পরিবহণ　　খ. পরিবহণ, বীমা, আদমানি
গ. পাইকারি, রপ্তানি, বণ্টন　　ঘ. আমদানি, রপ্তানি, পুনঃরপ্তানি

৪। জনাব আজীমের এই পণ্য বিনিময় কার্যক্রমকে কী বলা যায়?

ক. শুধু বাণিজ্য　　খ. অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য
গ. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য　　ঘ. শুধুমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্য

সৃজনশীল প্রশ্ন :

সিরাজ মিয়ার গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানায় কয়েকটি মাছের খামার এবং সবজির বাগান রয়েছে। এ খামারসমূহ হতে তিনি বছরে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। এজন্য তাকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদন ও ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হয়। অর্থসংস্থান, গুদামজাতকরণ ও পর্যায়িতকরণ এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণসহ সীমিত পরিসরে বিদেশে মাছ রপ্তানি করছেন। এজন্য তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কিন্তু উন্নত গুদামজাতকরণ এবং পর্যায়িতকরণের ব্যবস্থা না থাকায় সফলভাবে তিনি মাছ রপ্তানি করতে পারছেন না।

ক. ব্যবসায় কাকে বলে ?

খ. ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য ২টি কার্যাবলি বর্ণনা কর।

গ. সিরাজ মিয়াকে মাছ রপ্তানি করার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে তা চিহ্নিত কর।

ঘ. বিদেশে মাছ রপ্তানি করার ক্ষেত্রে গুদামজাতকরণ ও পর্যায়িতকরণের মধ্যে কোনটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর এবং কেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবসায়ের পরিবেশ
Business Environment

২.১ পরিবেশ কী (What is Environment)

পরিবেশ হল কোন স্থান বা অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যার মধ্যে বসবাস করে মানুষ জীবন ধারণ করে। অর্থাৎ, পরিবেশ বলতে একটি এলাকার সামগ্রিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানকে বুঝায়, যার মধ্যে বসবাস করে ঐ স্থানের জনগণ জীবিকা নির্বাহ করে। জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, জলাশয়, বনভূমি, ভূমির উর্বরতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সরকার, রাজনীতি, জাতি, ধর্ম, জনসংখ্যা, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি অপ্রাকৃতিক অবস্থা নিয়ে গঠিত হয় কোনো স্থানের পরিবেশ।

মানুষ আজন্ম পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত। তার জীবনধারা, আচার-আচরণ, শিল্প-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি কীরূপ হবে তা তার পরিবেশই নির্দিষ্ট করে দেয়। আবার মানুষও তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বীয় কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রয়াস পায়। অবশ্য, যদিও মানুষ নিয়ত প্রকৃতিকে বশে এনে তার অর্থনৈতিক গতিবিধির উন্নয়ন সাধন করে চলেছে, তথাপি তার অর্থনৈতিক জীবন প্রণালির ক্ষেত্রে সে পরিবেশকে কোনো মতেই উপেক্ষা করতে পারে না।

২.২ ব্যবসায়িক পরিবেশ (What is Business Environment)

ব্যবসায়িক পরিবেশ বলতে ব্যবসায়ের সেসব বহি পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বুঝায়, যেগুলো ব্যবসায় বা ফার্মের প্রবর্তন ও কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। কোনো স্থানে বিদ্যমান ব্যবসায়িক পরিবেশের ভিত্তিতে সেখানে ব্যবসায়–বাণিজ্য গড়ে উঠে। কাজেই, কোনো স্থানের ব্যবসায় ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে ব্যবসায়িক পরিবেশ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে। যাহোক, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, অর্থব্যবস্থা, সরকার, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মীয় সংস্কার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন প্রভৃতিকে ব্যবসায়িক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য করা হয়। এগুলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সংগঠন, নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিচালনার ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

২.৩ ব্যবসায়িক পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ (Factors Influencing Business Environment)

ব্যবসায়িক পরিবেশের উপাদানগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন– প্রাকৃতিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক পরিবেশ, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সামাজিক পরিবেশ। পরের পৃষ্ঠায় ছকের মাধ্যমে ব্যবসায়ের পরিবেশগত উপাদানগুলো তুলে ধরা হল :

চিত্র : ব্যবসায়ের পরিবেশগত উপাদানসমূহ
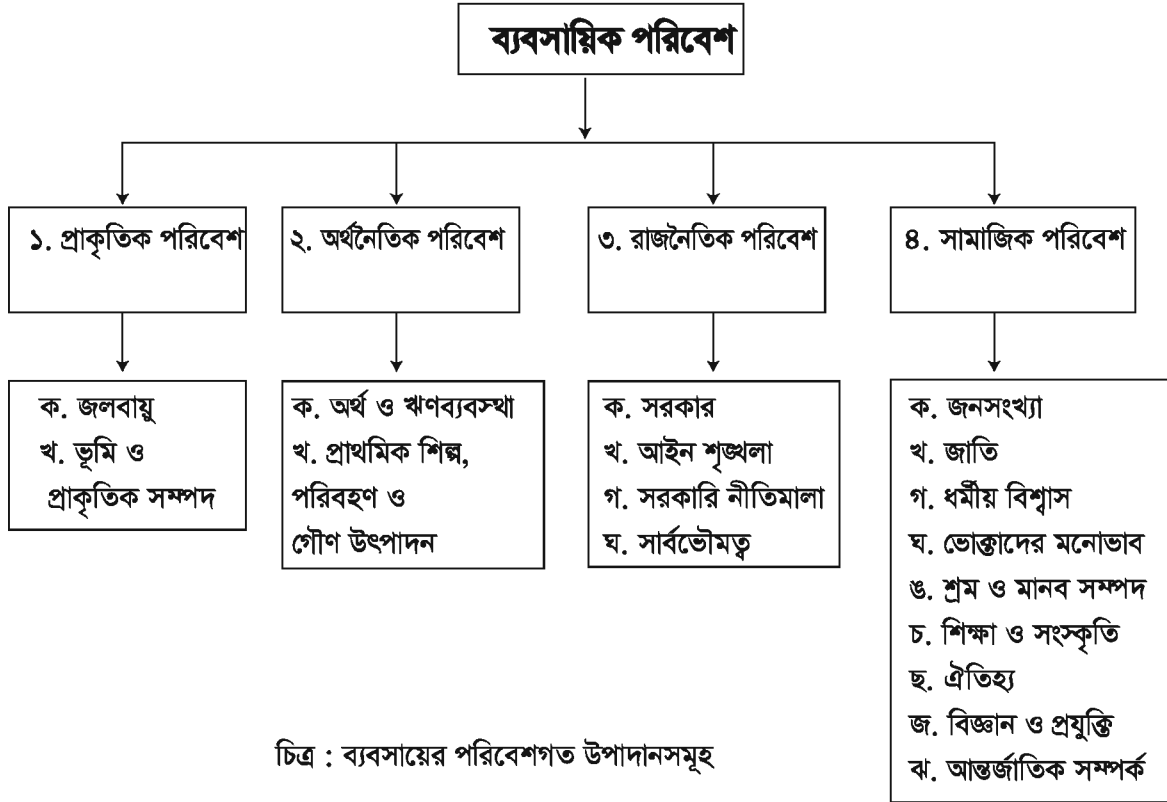
২.৩.১ প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment)

কোনো দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি নিঃসন্দেহে এর প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। একটি অঞ্চলের জলবায়ু, ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদাদি মিলে সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, যা সেখানকার শিল্প-বাণিজ্য ও মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে।

জলবায়ু

জলবায়ু (Climate) একটি স্থানের জনগণের আচার-আচরণ, কর্মস্পৃহা এবং শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রীয়করণ ও উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। জলবায়ুগত বিভিন্নতার কারণেই বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্য, জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উপজীবিকার মধ্যে তারতম্য ঘটে থাকে। অনুকূল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু প্রাচ্যের জাপান, পাশ্চাত্যের যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশকে শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত করেছে এবং জনগণকে করেছে স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। মোটকথা কোনো স্থানে শিল্পের কেন্দ্রীয়করণে জলবায়ুর প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান।

ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ

অর্থনীতির ভাষায় ভূমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে জল-স্থল, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, সাগর-জলাশয়, বন-জঙ্গাল, ভূ-প্রকৃতি, ভূমির উর্বরতা শক্তি, খনিজ সম্পদ প্রভৃতিকে বুঝায়।

ভূমি উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। ভূমি ছাড়া কোনোরূপ সম্পদ সংগ্রহ বা উৎপাদন কাজ চলতে পারে না।

জলাধার ও নদ-নদীর অববাহিকায় কৃষিকাজের অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান। এ কারণেই পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীবিধৌত বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। এ দেশের জনগণের প্রধান উপজীবিকাও তাই কৃষিকাজ। কোনো দেশের বন্ধুর অথবা সমতল ভূ-প্রকৃতি এর ব্যবসায়-বাণিজ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের উপজীবিকার ওপর

বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পাহাড়-পর্বত পরিবেষ্টিত এলাকায় রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ও শিল্প-বাণিজ্য গড়ে তোলা কঠিন। পক্ষান্তরে সমতল ভূ-প্রকৃতি শিল্প–বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য অনুকূল।

২.৩.২ অর্থনৈতিক পরিবেশ (Economic Environment)

জনগণের অভাব মোচনের উপকরণাদি সরবরাহের নিমিত্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহকরণ, উৎপাদন ও বণ্টনের প্রচেষ্টায় অবিরত নিযুক্ত থেকে মানুষ যে পরিবেশ সৃষ্টি করে তাকে অর্থনৈতিক পরিবেশ বলে। পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও দেশ-বিদেশের বাজারে বণ্টন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণিত হল :

অর্থ ও ঋণব্যবস্থা

ব্যবসায় প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য অর্থ ও ঋণ মূলধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবসায়ের একটি অপরিহার্য উপাদান। মূলধন বা পুঁজি ছাড়া কোনো ব্যবসায় চলতে পারে না। যে সমাজে অর্থ ও ঋণের সরবরাহ সহজ ও পর্যাপ্ত সেই সমাজে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। পক্ষান্তরে দুর্বল বা আক্রান্ত অর্থ ও ঋণ-পরিস্থিতি ব্যবসায়ের সংকোচন ঘটায়। এজন্য প্রায় সব দেশের সরকারই অর্থব্যবস্থাকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তুলে ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে।

প্রাথমিক শিল্প, পরিবহণ ও গৌণ উৎপাদন

প্রাথমিক উৎপাদন, পরিবহণ ও গৌণ উৎপাদন মানুষের উপজীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। সম্পদ সংগ্রহ, কৃষিকাজ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি প্রজনন প্রভৃতি প্রাথমিক শিল্প এবং যন্ত্রশিল্পের দ্বারা সম্পদ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ও সেবা সৃষ্টি গৌণ উৎপাদনের অন্তর্গত।

২.৩.৩ রাজনৈতিক পরিবেশ (Political Environment)

কোনো দেশের সরকার, আইন ও রাজনৈতিক অবস্থার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক পরিবেশ যা সেখানকার শিল্প-বাণিজ্যকে প্রভাবিত করে। সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অনুকূল সরকারি নীতিমালা (যেমন–শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি) ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করে।

দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য স্থিতিশীল ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিবেশ অত্যাবশ্যক। এরূপ পরিবেশ দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ীদেরকে শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত করে। আবার অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য দেশের সার্বভৌমত্ব একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এজন্য দেশে পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (সেনাবাহিনী ও রণসম্ভার মজুত) থাকতে হয়।

২.৩.৪ সামাজিক পরিবেশ (Social Environment)

সামাজিক পরিবেশ সমাজের জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা ও আচার-আচরণের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এর উপকরণগুলো হচ্ছে জনসংখ্যা, জাতি, ধর্ম, ভোক্তাদের মনোভাব, শ্রম ও মানব সম্পদ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রভৃতি। নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১. জনসংখ্যা : কোনো দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তার জনসংখ্যার ওপর নির্ভরশীল। সমাজের মানুষ একদিকে উৎপাদনকারী এবং অন্যদিকে ভোক্তা হিসেবে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। জনশক্তি উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। জনশক্তিকে বাদ দিয়ে কোনো উৎপাদন কাজ চলতে পারে না। তাই মানুষ একটি সম্পদও বটে। আবার ভোগকারী জনগণ পণ্যদ্রব্য ও সেবাদি ভোগের মাধ্যমে তাদের অভাব মোচন ও জীবনমান উন্নত করার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে। কাজেই কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও তাবৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাম্য জনসংখ্যা অনুকূল সামাজিক পরিবেশের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

জনসংখ্যার কমতি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত করে। আবার মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশ ও জাতির জন্য বোঝা ও অভিশাপস্বরূপ। এ অবস্থায় অভাব, অনটন, বেকারত্ব, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুতে দেশ ভরে যায়। দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশে এরূপ পরিস্থিতি বিরাজমান। অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপে এদেশ সমস্যায় জর্জরিত। এজন্য এখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২. জাতি (Race) : পৃথিবীতে জাতিভেদে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। জাতিভেদে জনগণের দৈহিক গঠন, আকার-আকৃতি, বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিতে বিপুল পার্থক্য বিদ্যমান, যার প্রভাব তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর জনসংখ্যাকে প্রধানত তিন প্রকার জাতির (Race) পর্যায়ভুক্ত করা যায়, যেমন-শ্বেতকায়, পীতকায় ও কৃষ্ণকায় জাতি। শ্বেতকায় লোকেরা দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান, সাহসী, পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান। তারা শিক্ষা–দিক্ষা ও শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রসর। পীতকায় জাতির লোকদের গঠন খর্বাকৃতি হলেও তারা স্বাস্থ্যবান, অধ্যবসায়ী, সাহসী ও বুদ্ধিমান। এরাও শিল্প-বাণিজ্যে পারদর্শী। কৃষ্ণকায় জাতির জনগণ তুলনামূলকভাবে নিস্পৃহ ও অলস এবং মেধার দিক থেকেও দুর্বল। তারা অন্যান্য জাতির ন্যায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে পারদর্শী নয়।

৩. ধর্মীয় বিশ্বাস : ধর্ম মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে প্রভাব বিস্তার করে। এক এক ধর্মাবলম্বী জনগণ এক এক রূপ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত যার প্রতিফলন তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উপজীবিকার ওপর বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। ইসলাম ধর্মে মদ্যপান ও সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই, মুসলমান সমাজে মদ্য উৎপাদন ও অর্থলগ্নী ব্যবসায় বিঘ্নিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মে জীবহত্যা মহাপাপ। তাই, তাদের মধ্যে পশুপালন ও মাংস ব্যবসায় বাধাপ্রাপ্ত হয়। হিন্দু ধর্মের বর্ণবৈষম্য প্রথা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নানারূপ প্রতিকূলতার সৃষ্টি করে। খ্রিষ্টান ধর্মের রীতি-নীতি বা অনুশাসন এ ধরনের সংস্কার থেকে মুক্ত। তাই তাদের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রচলন অধিক।

৪. ভোগকারী জনগণের মনোভাব : জনগণের অভাব পূরণের জন্য পণ্যদ্রব্য ও সেবাদি উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়। কাজেই, ব্যবসায়-বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি ভোক্তাসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, অভিরুচি, চাহিদা, ফ্যাশন প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধীর গতিতে হলেও মানুষের অভিরুচি, ধ্যান-ধারণা, ফ্যাশন ইত্যাদিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ব্যবসায়ীকে এসব সাংস্কৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি বিধান করে উৎপাদন ও বণ্টন কার্য পরিচালনা করতে হয়। আবার ব্যবসায়ীরাও বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মাধ্যমে সমাজের জনগণের অভিরুচি ও চাহিদাকে প্রভাবিত করে থাকে। কাজেই, ভোগকারী জনগণের গতিশীল অভিরুচি ও মনোভাব ব্যবসায় ক্ষেত্রে এক অনুপম বহিঃস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার প্রতি সমধিক গুরুত্ব প্রদান করে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়-বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৫. শ্রমশক্তি বা মানব সম্পদ : ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনশক্তি উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান। শিল্পের সাফল্য সুস্থ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ শ্রমশক্তির ওপর নির্ভর করে। শ্রমিকদের দক্ষতা ও ঐকান্তিকতা শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শিল্প-কারখানায় শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রম-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক শিল্পোন্নয়নের বিরাট সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

৬. শিক্ষা ও সংস্কৃতি : মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমাজে এক অনুপম অপ্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার সৃষ্টি করে, যার প্রতিফলন ঘটে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে। শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত মানুষেরা তাদের চারপাশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে উৎপাদনের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। এ কারণেই জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-দীক্ষায় সমৃদ্ধ ইংরেজ জাতি শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত।

৭. ঐতিহ্য : জনগণের ঐতিহ্য অপ্রাকৃতিক পরিবেশের একটি মূল্যবান উপকরণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে দেখা যায়, বিশেষজ্ঞতা বা কারিগরি দক্ষতার কারণে কোনো কোনো অঞ্চলের কিছু কিছু লোক এক প্রকার পেশায় জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করছে এবং বংশ পরম্পরায় সেই পেশাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ ও বিশেষজ্ঞতার ব্যবস্থা থেকে এরূপ ঐতিহ্যগত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ ঐতিহ্য অধিক মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। টাঙ্গাইলের তাঁত শিল্প ও সিলেটের বাঁশ-বেত শিল্প এই প্রকার ঐতিহ্যগত সামাজিক পরিবেশের ফল।

৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : কোনো দেশের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে জনগণ প্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে নিজেদের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে। এর ফলে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও সেবাসমূহের উৎকর্ষ সাধিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উন্নত ব্যক্তিবর্গ সমাজের জন্য উন্নত পণ্যদ্রব্য ও সেবা পরিবেশন করতে পারে। ফলে সভ্যতা, সংস্কৃতির অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন সাধিত হয়। সুতরাং, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক কলা-কৌশল ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৯. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relation)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ব্যবসায়িক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, মুক্তবাজার নীতি, সাধারণ বাজারব্যবস্থা প্রভৃতি একটি দেশের বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। বিভিন্ন দেশের সাথে রাজনৈতিক সম্প্রীতি একটি দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে সহায়তা করে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়, কোনো স্থানের ব্যবসায়-বাণিজ্য উন্নয়নে তার পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কাজেই, সব রকম ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বিদ্যমান ব্যবসায়িক পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশকে উপেক্ষা করে কোনোরূপ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় পরিবেশগত উপাদানগুলো উপেক্ষিত হলে তা অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত হবে।

অনুশীলনী

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। প্রাথমিক শিল্প কোন পরিবেশের অন্তর্গত ?

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশ   খ. অর্থনৈতিক পরিবেশ

গ. রাজনৈতিক পরিবেশ   ঘ. সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ

২। ইসলাম ধর্মে মদ্যপান ও সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ, তাই মুসলমান সমাজে –

i. মদ্য উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়

ii. অর্থলগ্নী ব্যবসায় বিঘ্নিত হয়

iii. হোটেল ব্যবসায় বাধাগ্রস্থ হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. i ও ii

গ. i ও iii   ঘ. ii ও iii

৩। সরকার ও জলবায়ু যথাক্রমে পরিবেশের কোন উপাদানের অন্তর্গত ?

i. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ
ii. রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ
iii. অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

আনোয়ার হোসেন পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছেন বাংলাদেশের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক ভাল। এই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে। এ দেশ থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নে চিংড়ি, পোষাক ও চামড়া জাতীয় দ্রব্য রপ্তানি হয়।

৪। বাণিজ্য চুক্তি না থাকার ফলে কী হয় ?

ক. সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানি করা যাবে না
খ. সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে তৈরি পোষাক রপ্তানি করা যাবে না
গ. সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে চামড়া জাতীয় দ্রব্য রপ্তানি করা যাবে না
ঘ. সংশ্লিষ্ট দেশের মধ্যে উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করা যাবে না

সৃজনশীল প্রশ্ন

মানুষ আজন্ম পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত। তার জীবনধারা আচার-আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি-প্রকৃতি কীরূপ হবে তা তার পরিবেশই নির্দিষ্ট করে দেয়। আবার মানুষও তার জ্ঞান বুদ্ধি ও প্রভাব দ্বারা পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে প্রকৃতি ও পরিবেশকে স্বীয় কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রয়াস পায়। জনাব জামালের পূর্বপুরুষ যমুনা নদীর পারে বসবাস করত এবং ফসলী জমি চাষাবাদ করে সংসার পরিচালনা করত। সম্প্রতি বন্যার কারণে চাষের জমি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় জনাব জামাল মৎসশ্রমিক হিসেবে অন্যের নৌকায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

ক. ব্যবসায়িক পরিবেশ কী ?
খ. সামাজিক পরিবেশের ২টি উপাদানের বর্ণনা দাও।
গ. জনাব জামালের জীবিকার উপর ব্যবসায়িক পরিবেশের কোন কোন উপাদান প্রভাব বিস্তার করছে তা বর্ণনা কর।
ঘ. জনাব জামালের মৎসশ্রমিকে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মকর্মসংস্থান
Self-Employment

৩.১ আত্মকর্মসংস্থান কী (What is Self Employment)

নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি সেবাদানের বিনিময়ে বা ব্যবসায় পরিচালনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে জীবিকা চালায় তখন একে আত্মকর্মসংস্থান পেশা বলে। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি নিজেকে কোনো না কোনো ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে। একজন গৃহিণী ঘরে বসে হাঁস-মুরগি পালন, জাল বুনন, পোশাক তৈরি প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। তেমনি ভূমিহীন, বিত্তহীন, শিক্ষিত, আধাশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুব সমাজ স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে সক্ষম হয়। তারা নিজ উদ্যোগে ছোটখাটো মাছের খামার, গরু-ছাগলের খামার, ফলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ফুল চাষ, সবজি খামার ও নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান নিজেরাই করতে পারে। এ কাজে তেমন কোনো মূলধন প্রয়োজন হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ব্যবসায় উদ্যোগ, দু'টি কর্মঠ হাত, স্বল্প প্রশিক্ষণ ও প্রবল আত্মবিশ্বাস।

৩.২ আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Self-Employment)

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ। এদেশে সমস্যার অন্ত নেই। দারিদ্র্য, জনসংখ্যাধিক্য, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে জর্জরিত করে রেখেছে। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব নিরসন করা গেলে অন্যান্য সমস্যা সমাধান দুরূহ নয়। বাংলাদেশের মত ছোট ও জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সহজ নয়। দেশে চাকরির সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। চাকরির সংখ্যা ইচ্ছা করলেই বৃদ্ধি করা যায় না। দেশে সরকারই প্রধান চাকরিদাতা হিসেবে পরিগণিত। অথচ সরকারি খাতে চাকরির সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রয়োজনানুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এ অবস্থায় বেকার সমস্যা দূরীকরণে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া আমাদের সামনে বিকল্প কোন পথ নেই।

বাংলাদেশ প্রায় ১৪ কোটি মানুষের দেশ। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। তাদের যেমন নেই লেখাপড়া, তেমন নেই কর্মসংস্থানের সুযোগ। তাই কর্মসংস্থানের সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত শহরে ভিড় জমাচ্ছে। শহরে বাড়ছে জনসংখ্যার চাপ। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে যুবক-যুবতী। এর মধ্যে প্রায় দুই কোটি যুবক-যুবতী বেকার। অথচ যুবক-যুবতীরাই হচ্ছে দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি। এরাই হচ্ছে সকল কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ও ভবিষ্যতের কর্ণধার। আজকের বাংলাদেশের বেকার যুব সমাজের চিত্র শুধু উদ্বেগজনক নয়, ভয়ংকরও বটে। এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সমাজে শুধু যে হতাশা বাড়ছে তা নয়, বরং নানাবিধ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দ্বারাও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা, বাড়ছে অস্থিরতা ও সামাজিক অপরাধ। তাই শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুব শক্তিকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত উদ্যোগ। বৃত্তিমূলক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের বিভিন্ন বৃত্তিতে দক্ষ করে

আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া আমাদের ব্যাপক বেকারত্ব মোকাবিলায় আর অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যুব সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দেশের বেকার সমস্যাই শুধু নিরসন হবে তা নয়; সামাজিক অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিচে সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরা হল :

(ক) বেকারত্ব দূরীকরণ।

(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

(গ) আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমুখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা।

(ঘ) জনশক্তি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন।

(ঙ) দেশপ্রেমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে উৎসাহিত করা।

৩.৩ আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র (Area of Self-Employment)

বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্য-পীড়িত জনবহুল দেশ। দেশে যে হারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক কম হারে চাকরির সুযোগ বাড়ছে। দেশের বৃহত্তর যুব সমাজ চাকরির পেছনে ধাওয়া না করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে। এ জন্য যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আত্মকর্মসংস্থানের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঁটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতির ওপর। এ অধিদপ্তর ও সংস্থা আত্মকর্মসংস্থানের কতকগুলো ট্রেড চিহ্নিত করেছে এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। নিচে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করা হল :

(১) হাঁস-মুরগি পালন (২) গবাদি পশু ও ছাগল পালন (৩) মৎস চাষ (৪) সবজি বাগান তৈরি (৫) ফুলের চাষ (৬) নার্সারী/বনায়ন (৭) মৌমাছি চাষ (৮) তুঁত চাষ/রেশম চাষ (৯) বাঁশ ও বেতের কাজ (১০) হস্ত শিল্প কুঁটির শিল্প, মৃৎ শিল্প (১১) সেলাই/পোশাক তৈরি (১২) আচার/জ্যাম জেলি প্রস্তুতকরণ (১৩) ব্লক ও বাটিক প্রিন্ট (১৪) শাড়ি ও পোশাক নকশা (১৫) কাপড়/চামড়ার ব্যাগ তৈরি (১৬) পশুখাদ্য প্রস্তুতকরণ (১৭) পাটি বুনন (১৮) নকশীকাঁথা (১৯) ওয়েলডিং (২০) উন্নতমানের গ্রামীণ চুল্লী তৈরি (২১) ইলেকট্রিক ওয়ারিং (২২) রিক্সা, সাইকেল, মোটর সাইকেল ও গাড়ি মেরামত (২৩) উল বোনা (২৪) রিফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনের মেরামত (২৫) রেডিও, টিভি, ভিসিআর, ভিসিপি ইত্যাদি মেরামত (২৬) কম্পিউটার অপারেশন ও মেরামত (২৭) গ্রামীণ স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরি (২৮) রাবার চাষ (২৯) পাম্প চালনা, গাড়ি চালনা প্রভৃতি। সরকারি এবং এন. জি. ও. পর্যায়ে আরো নতুন নতুন ট্রেড অন্তর্ভুক্ত করা এবং সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

৩.৪ আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় (Requisits for Self-Employment)

বাংলাদেশের মত ছোট অথচ অত্যন্ত জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সহজ নয়। দেশে চাকরির সুযোগ সীমিত। সরকারি খাতে ইচ্ছা করলেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায় না। দেশে শিল্পায়নের হার সন্তোষজনক নয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিও এ বিপুল সংখ্যক বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে অপারগ। ফলে দেশে বেকারদের সংখ্যা দেশে দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দেশে বেকারদের প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। এরা আবার দক্ষ ও অদক্ষ এ দুভাগে বিভক্ত। আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা এদের অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট নয়। নিজের জীবিকা যে নিজের প্রচেষ্টাতেই

অর্জন করা সম্ভব এ ব্যাপারে অনেকেই জ্ঞাত নয় বা বিশ্বাসী নয়। যাদের এ সম্বন্ধে ধারণা রয়েছে, তাদের সামনেও এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্বচ্ছ রূপরেখা অনুপস্থিত। আত্মকর্মসংস্থান বলতে মূলত এরা ব্যবসায়কেই বুঝে থাকে। অথচ দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত অশিক্ষিত, স্কুল কলেজ থেকে ছিটকে পড়া যুবক-যুবতী এবং উচ্চ শিক্ষিত বিশাল এ যুব সমাজকে ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান করতেও অভিভাবকগণ অপারগ। তাই আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো, যেমন– হাঁস-মুরগি পালন, ডেইরি ফার্ম, মৌমাছির চাষ, মৎস্য চাষ, সমবায় সমিতি, ফল ও সবজি চাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন প্রভৃতি যেমন স্বল্প পুঁজির মাধ্যমে স্থাপন করা সম্ভব তেমনি সম্মানজনক এবং লাভজনক কাজও বটে। খুব বেশি মূলধন নয়, এজন্য প্রয়োজন দু'টি কর্মঠ হাত ও প্রবল আত্মবিশ্বাস। আত্মকর্মসংস্থানে আমাদের যুব সমাজকে উৎসাহিত করার জন্য করণীয় কাজগুলো নিম্নরূপ :

(১) বেকার যুবক, যুব-মহিলাদের বুঝতে হবে যে, কোনো কাজই ছোট বা অপমানজনক নয়।

(২) আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে তাদেরকে সকল ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(৩) স্কুল, কলেজ থেকে ছিটকে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

(৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা যাতে দ্রুত ও যথাযথভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উদ্যোগ নিতে পারে সেজন্য উপদেশ বা পথ-নির্দেশ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) সর্বস্তরের শিক্ষাকে কর্মমুখী করার ওপর জোর দিতে হবে। পাঠ্যসূচিতেও বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

(৬) পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সম্পদ ও প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে কৃষি ও শিল্পের ওপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এ ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজ কল্যাণ বিভাগ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, গ্রামীণ ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে আত্মকর্মসংস্থানের প্রকল্প রয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য প্রত্যেক থানা থেকে কয়েকজনকে নির্বাচন করতে হবে। অতঃপর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যমগুলোতে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে কৃতকার্য প্রকল্পগুলো বেশি বেশি প্রচার করতে হবে এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

৩.৫ ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা (Business Entrepreneurship And Entrepreneur)

একটি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে উদ্যোক্তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প উদ্যোক্তা দেশের বস্তুসম্ভার ও জনসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। ব্যবসায় উদ্যোগ ও ব্যবসায় উদ্যোক্তা শব্দ দু'টি একটির সঙ্গে অন্যটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি বুঝা সম্ভব নয়। ব্যবসায় উদ্যোগ বলতে একটি সংগঠন স্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে বুঝায়। আর যে উদ্যোগ গ্রহণ করে তাকে বলা হয় উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তা একজন দক্ষ সংগঠক। সে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ঝুঁকি ও দায়-দায়িত্ব বহন করে এবং বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকা উৎপাদনের উপকরণগুলো, যেমন– ভূমি, শ্রম, পুঁজি, প্রযুক্তি ইত্যাদি সংগ্রহ ও সমন্বিত করে ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে। সুতরাং উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যে ঝুঁকি গ্রহণ করে, স্বীয় প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা ব্যবসায় সংগঠন গঠন করে এবং প্রেরণার মাধ্যমে এটিকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

পূর্ব পৃষ্ঠার আলোচনা থেকে ব্যবসায় উদ্যোগ ও উদ্যোক্তার অর্থ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবসায় উদ্যোক্তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায়ের গতিকে ত্বরান্বিত করে। আর উদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যে ব্যবসায় উদ্যোগ সংক্রান্ত গুণাবলির অধিকারী। সে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। অতঃপর সে এর বাস্তবায়ন ও একে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছানোর জন্য যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বহন করে।

৩.৬ একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তার প্রয়োজনীয়তা (Need for Business Entrepreneur in the Economic Development of a Country)

উন্নত, অনুন্নত এবং ছোট বড় সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাদের উন্নয়নের মূলে রয়েছে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকা। উদ্যোক্তারা দেশে প্রাপ্ত সম্পদ ও জনশক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে। তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তিরও পরিবর্তন এনেছে।

বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল দেশ। যথেষ্ট প্রাকৃতিক ও জনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তার অভাবে এগুলো সদ্ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শিল্প ও ব্যবসায়ের যেমন বিকাশ ঘটছে না, ঠিক তেমনি সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় এবং বেকারত্ব দিন দিন বেড়েই চলছে।

দক্ষ উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় দেশে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বেড়ে যায় বিনিয়োগের সুযোগ। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়। আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড এবং কর্মসংস্থানের প্রধান দু'টি উপায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান। উদ্যোক্তারা স্বল্প ব্যয়ে ও প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। শুধু পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্যই যে উদ্যোক্তার প্রয়োজন তা নয়, দেশের যুবকদের মেধা, উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যমের উন্নয়ন এবং তাদেরকে সুসংগঠিত করে কাজে লাগানোর মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতেও উদ্যোক্তারা বিশেষ অবদান রাখে।

৩.৭ উদ্যোক্তার গুণাবলি (Qualities of an Entrepreneur)

ব্যবসায়ের সাফল্য শুধুমাত্র পুঁজি ও অন্যান্য উপকরণের ওপর নির্ভর করে না। সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সফল উদ্যোক্তার। সফল উদ্যোক্তার কতকগুলো ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থাকা আবশ্যক। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, বয়স, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, কৌশল ও সততা, অর্থোপার্জনের মনোভাব প্রভৃতি । সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো হল পেশাগত অভিজ্ঞতা, মূলধন যোগানো ও ব্যবহারের ক্ষমতা, প্রযুক্তির জ্ঞান, নেতৃত্ব, সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার, দক্ষতা, পারিবারিক মর্যাদা প্রভৃতি। আর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে সাফল্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব, দূরদৃষ্টি, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস, উদ্ভাবনী শক্তি, আত্মপ্রত্যয়, প্রতিশ্রুতি ও কঠোর পরিশ্রম করার ইচ্ছা। ভারতের টাটা, বিরলা, আমেরিকার ফোর্ড, রকফেলার, বাংলাদেশের আর. পি. সাহা প্রভৃতি উদ্যোক্তাদের সাফল্যের পেছনে কতকগুলো স্বতন্ত্র গুণাবলির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নে কতিপয় প্রয়োজনীয় গুণাবলির ব্যাখ্যা দেওয়া হল :

১। সাংগঠনিক ক্ষমতা : উদ্যোক্তার সাংগঠনিক ক্ষমতা থাকতে হবে। ছড়ানো ছিটানো উৎপাদনের উপকরণগুলো আপনা আপনি সংগঠিত হতে পারে না। উদ্যোক্তা উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করে থাকে।

২ সাফল্য অর্জনের আকাঙ্খা : সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা উদ্যোক্তার ব্যতিক্রমধর্মী একটি গুণ। নিজের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। জয়ী হবার জন্য থাকে তার অদম্য ইচ্ছা। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সে ব্রতী হয় সুদৃঢ় মনোবল আর আত্মপ্রত্যয়ে। সাফল্য অর্জন হয় তার চূড়ান্ত লক্ষ্য।

৩। ঝুঁকি গ্রহণ : উদ্যোক্তাকে উদ্যম, সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। ব্যবসায়ে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান। উদ্যম, সাহস ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে উদ্যোক্তা ঝুঁকিসম্পন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্রতী হয়। সুতরাং, উদ্যোক্তার ঝুঁকি গ্রহণের মনোভাব ও সাহস থাকতে হয়।

৪। বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতা : উদ্যোক্তাকে হতে হবে সাধারণের চাইতে অধিক সতর্ক, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। তাকে ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি তীক্ষ্ণভাবে প্রত্যক্ষ করতে হয়। এ জন্য তার বুদ্ধিমত্তা ও সতর্ক দৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজন।

৫। উদ্ভাবনী ক্ষমতা : সফল উদ্যোক্তাকে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হতে হয়। ব্যবসায়ের নিত্য-নতুন ক্ষেত্র ও কলা- কৌশল উদ্ভাবন, নতুন পণ্য সৃষ্টি, কাঁচামালের উৎস সন্ধান, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার প্রভৃতি উদ্যোক্তার উদ্ভাবনী শক্তির বিভিন্ন দিক।

৬। সুযোগের সদ্ব্যবহার : সুযোগ সব সময় আসে না। ব্যবসায়ের সাফল্য সুযোগের সদ্ব্যবহারের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা উদ্যোক্তার একটি বিশেষ গুণ।

৭। ব্যক্তিত্ব : উদ্যোক্তাকে মোহনীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হতে হয়। তার এরূপ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে কর্মচারি ও ক্রেতারা হবে অভিভূত। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মত সাহস ও মনোবল তার থাকতে হবে।

৮। পরিশ্রমী : পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। সাফল্যের জন্য উদ্যোক্তাকে হতে হয় কঠোর পরিশ্রমী। উদ্যোক্তা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও কাজ করতে আনন্দ পায়। ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনে তাকে নিরলস শ্রম দিতে হয় এবং ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ পরিহার করতে হয়।

৯। কাজের প্রতি অঙ্গীকার : ব্যবসায় একটি জটিল কাজ। ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণকারী নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এ কাজে নিয়োজিত করে থাকে। সাফল্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তাকে কাজে মগ্ন থাকতে হয়। লক্ষ্য হাসিলের জন্য তাকে থাকতে হয় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

৩.৮ কতিপয় সফল উদ্যোক্তার জীবনী

নিম্নে বাংলাদেশের কয়েকজন সফল উদ্যোক্তার ব্যবসায়িক সাফল্যের কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

৩.৮.১ রনদা প্রসাদ সাহা (আর. পি. সাহা)

আমরা টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমস্, কুমুদিনী হাসপাতালের স্কুল অব নার্সিং, টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজ, এস. কে. হাই স্কুল, মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের নাম শুনেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা একজন মাত্র ব্যক্তি। এ হিতৈষী ব্যক্তির নাম রনদা প্রসাদ সাহা। তিনি কিন্তু খুব ধনী লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। স্বীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাবলে তিনি বড় হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের একটি সাধারণ পরিবারে ১৮৯৮ সালে তাঁর জন্ম। পৈতৃক নিবাস টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে। তাঁর পিতা দেবেন্দ্র পোদ্দার ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন। তখনকার দিনে সাহা বা পোদ্দার পরিবারের ছেলেদের বেশি লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হত না– পাছে ব্যবসায়ের প্রতি যদি তাদের অনাসক্তি জন্মে সে আশঙ্কায়। রনদা প্রসাদ পাঠশালায় নিম্ন প্রাইমারির অধিক শিক্ষা পাননি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বাড়ি থেকে পলায়ন করে তিনি যুদ্ধে নাম লিখান এবং 'বেঙ্গাল এম্বুলেন্স কোরে' পুরুষ নার্স হিসেবে কাজে যোগ দেন। তিনি কাজের প্রতি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বীয় প্রচেষ্টায় তিনি মেসোপটেমিয়ার (ইরাক) যুদ্ধ ক্ষেত্রের আহত অনেক সৈনিকের প্রাণ রক্ষা করেন। এর স্বীকৃতিস্বরূপ যুদ্ধ শেষে ইংল্যান্ডের সম্রাটের সঙ্গে তাঁর দেখা করার সৌভাগ্য ঘটে। পরবর্তীতে দেশে ফেরার পর যুদ্ধের ভেটার্ণ (প্রবীণ যোদ্ধা) হিসেবে তাঁকে রেলের টিকিট কালেক্টরের চাকরি দেওয়া হয়। ১৯৩২ সালে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। চাকরি জীবনের অবসানের পর তিনি ছোট একটি কয়লার ব্যবসায় শুরু করেন। এ সময় তিনি দেখলেন, জনৈক লঞ্চ মালিক বেশ কিছুদিন ধরে তাঁকে কয়লার দাম পরিশোধ করছে না। কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা করলে তারা উত্তর দিল, তার ব্যবসায় ভাল চলছে না। এ কারণে সে লঞ্চ বিক্রি করার জন্য খরিদ্দার খুঁজছে। রনদা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি পাওনা টাকা আদায় ও স্বল্প মূল্যে লঞ্চটি ক্রয় করলেন। লঞ্চটি ছিল পুরাতন। তাই,

মেরামতের জন্য প্রায়ই ডকইয়ার্ডে প্রচুর টাকা দিতে হত। তিনি চিন্তা করলেন যদি নিজে ডকইয়ার্ড বানানো যায়, তাহলে তাঁর লঞ্চ মেরামত ব্যয় হ্রাস পাবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য লঞ্চ মালিকদের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করা যাবে। এভাবে কিছুদিনের মধ্যে কয়লা হতে লঞ্চ এবং লঞ্চ হতে ডকইয়ার্ড একে একে তার ব্যবসায়ের অন্তর্ভুক্ত হল। তবে এ ব্যবসায়ে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তা তার ছিল না। তাই, তিনি কয়েকজন বিত্তশালী অংশীদার নিয়ে "বেঙ্গল রিভার সার্ভিস কোম্পানি" চালু করেন। এ কোম্পানির অংশীদার ছিলেন মহেড়ার জমিদার নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ডা. বিধান চন্দ্র রায়, ধনপতি ও রাজনীতিবিদ নলিনী রঞ্জন সরকার এবং জাস্টিস কে. এন. মজুমদার। প্রথম অবস্থায় তিনি এ কোম্পানিতে একজন সহযোগী ছিলেন। পরে অন্যরা ঝুঁকি নিতে অস্বীকার করে ব্যবসায় ছেড়ে দিলে তিনি তাদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করে নিজেই এ কোম্পানির মালিক হন। তার ছিল ঝুঁকি নেওয়ার অসাধারণ সাহস ও অদম্য মানসিক দৃঢ়তা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। জাপানিরা ব্রহ্মদেশ (মিয়ানমার) দখল করে নিল। ব্রহ্মদেশই ছিল চাউলের জন্য ইংরেজদের প্রধান ভরসা। তাই, ব্রহ্মদেশ হাত ছাড়া হওয়ার পর তারা সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসনের খাতিরে প্রচুর চাউল কেনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সাথে রনদা সাহার পরিচয় ছিল। সরকার চাউল ক্রয়ের জন্য চারজন এজেন্ট নিয়োগ করল। রনদা সাহার নাম এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল। এ ব্যবসায়ে রনদা অনেক লাভবান হলেন এবং ১৯৪৪ সালে রনদার অর্জিত মূলধনের পরিমাণ লক্ষ টাকায় দাঁড়াল। বলাবাহুল্য তখন লক্ষ টাকা এখনকার কয়েক কোটি টাকার সমান। কিন্তু, এ টাকা তার মনে এক ভাবান্তর সৃষ্টি করল। নিজের বাল্যকালে বিনা চিকিৎসায় মাতার মৃত্যু, যুদ্ধকালে সৈন্যদের দুঃসহ অবস্থা স্মরণ করে জীবন সম্পর্কে তিনি এক অদ্ভূত চেতনা অনুভব করলেন। ১৯৪৪ সালে রনদা সাহা মির্জাপুরের ভুতুড়ে খাল বলে পরিচিত এলাকায় ৫০ বেডের হাসপাতাল ও একটি দাতব্য ডিসপেন্সারি স্থাপন করেন। এ সময়ে নারায়ণগঞ্জের অতি প্রাচীন পাট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান জর্জ এন্ডারসন কোম্পানি তাদের পাট ব্যবসায় তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে রনদা সাহা এ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং জর্জ এন্ডারসনের পাটের ব্যবসায় ক্রয় করেন। বেঙ্গল রিভার সার্ভিসের সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জে পাটের বেইলিং, ভাড়া দেওয়ার জন্য পাটের গুদাম এবং একটি ডকইয়ার্ড চালু করলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে তার মোট মূলধণের পরিমাণ দাঁড়াল দুকোটি টাকার মত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তিনি তার সম্পূর্ণ ব্যবসায় থেকে যে আয় হত তা দ্বারা একটি দাতব্য ট্রাস্ট গঠন করেন। এটাই কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট নামে খ্যাত। প্রথমেই আমরা তার স্থাপিত জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উল্লেখ করেছি। এ সকল প্রতিষ্ঠান এ ট্রাস্টের লভ্যাংশ হতেই পরিচালিত হত। নিজের ভরণ-পোষণের ব্যয় ছাড়া আর কিছুই তিনি এ ট্রাস্টের লভ্যাংশ হতে গ্রহণ করতেন না। বাংলাদেশে অনেক ধনী ব্যবসায়ী ব্যবসায় করে গেছেন। কিন্তু, নিজের সর্বস্ব মানবতার সেবায় এভাবে দান করার দৃষ্টান্ত বিরল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিত্তশালী হিন্দুরা অনেকেই ভারতে চলে যান। কিন্তু, রনদা সাহা তাঁর মাতৃভূমি ত্যাগ করেননি। এমনকি ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয় তখনও তিনি এদেশে থেকেই মাতৃভূমির সেবা করার প্রতিজ্ঞা করেন। ফল হল অত্যন্ত দূর্ভাগ্যজনক। ১৯৭১ সালের ৭ই মে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা তাঁকে এবং তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ভবানী সাহাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। পরে তাদের আর কোনো সন্ধান মেলেনি। উদ্যোক্তা হিসেবে রনদা সাহার চরিত্রে যেসব গুণ ছিল তন্মধ্যে সংগঠন যোগ্যতা, ঝুঁকি নেয়ার সাহস, ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার অন্যতম। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন বন্ধুবৎসল, দানশীল এবং অনন্য সমাজসেবী। তিনি ছিলেন শিক্ষা অনুরাগী। আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত। তিনি যে আদর্শ আমাদের সামনে রেখে গেছেন তা এ দেশবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ রাখবে।

৩.৮.২ গুলবক্স ভুঁইয়া

গুলবক্স ভুঁইয়া বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পরিচিত নাম। ১৯১৩ সালে ঢাকা জেলার রূপগঞ্জ থানার মুর্তজাবাদ গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম এলাহি বক্স। তিনি ছিলেন একজন কৃষক। বর্ষা মৌসুমে কৃষি কাজের ফাঁকে তিনি পাটের ব্যবসায় করতেন।

গুলবক্স খুব বেশি লেখাপড়া করতে পারেননি। তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তাঁর গ্রামের প্রায় ঘরেই তাঁত ছিল। তিনি লক্ষ্য করেন, এসব তাঁতীদের সবাই নারায়ণগঞ্জ থেকে সুতা সংগ্রহ করে। তার বয়স যখন ষোল তখন তিনি পিতার অজ্ঞাতে খুব স্বল্প পুঁজি নিয়ে সুতার ব্যবসায় শুরু করেন। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন মহাজনের নিকট হতে তিনি সুতা সংগ্রহ করতেন। এ সময় স্থানীয় ভুলতা বাজারে তিনি একটি ছোট দোকানের ব্যবস্থা করেন। নিজে কাঁধে করে বিভিন্ন হাটে সুতা বহন করতেন। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, সৎ ও নিষ্ঠাবান। মানুষের সঙ্গে ভাল ব্যবহারে তাঁর সুনাম ছিল। কখনও কথার বরখেলাপ করতেন না। এজন্য নারায়ণগঞ্জে সুতার মহাজনরা তাঁকে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর কাছে মাল ধারে বিক্রি করতেন। এভাবে সুতার ব্যবসায়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

১৯৪৩ সালে গুলবক্স ভুঁইয়া পার্শ্ববর্তী মুড়াপাড়া বাজারে খাদ্যদ্রব্যের ডিলার মনোনীত হন। সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরবর্তী বছর তিনি সরকারি ডিলার নিযুক্ত হন। তখন মুড়াপাড়া বাজারে তিনি একটি ভাড়া করা দোকানে কাজ চালাতেন। ১৯৪৭ সালে তিনি নারায়ণগঞ্জে একটি সুতার দোকান দিলেন। তাঁর সততা ও সুনামের জন্য নারায়ণগঞ্জের সুতার পাইকারি মহাজনরা তাঁকে বাকিতে সুতা দিয়ে সাহায্য করতেন। ইতোমধ্যে সুতার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৫৩ সালে তিনি সুতার পাইকারি ডিলার নিযুক্ত হন। এ সময় নরসিংদী, মাধবদী, বাবুরহাট, শাহজাদপুর, পাবনা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলের সুতার ব্যবসায়ীরা তাঁর নিকট থেকে সুতা ক্রয় করত। ব্যবসায়িক সততার জন্য বাজারে তাঁর সুনাম ছিল এবং এজন্য সকল সময়ই তিনি বড় বড় মহাজন ও মাড়োয়ারিদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেতেন। তাঁর ব্যবসায়িক সততার উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা জানা যায়। ১৯৫৩ সালের কথা। তিনি নারায়ণগঞ্জ আরব লিমিটেডের নিকট থেকে বিশ বেল সিঙ্গেল সুতা ক্রয় করেন। তখনকার দিনে এর আনুমানিক মূল্য ছিল ষোল হাজার টাকা। দোকানে নিয়ে সুতার বেল খুলে তিনি দেখতে পেলেন সকল গাঁইটে সিঙ্গেল এর পরিবর্তে ডবল সুতা রয়েছে। তিনি এ সুতা বিক্রি বন্ধ রেখে মহাজনের নিকট ব্যাপারটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। এ সুতা তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়েছিল বিধায় সেখানকার রপ্তানিকারককে বিষয়টি অবহিত করা হয়। তাদের কাগজপত্রেও সিঙ্গেল সুতা হিসেবে এর বর্ণনা ছিল। ঐ পরিমাণ ডবল সুতার তখনকার বাজার মূল্য ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। একজন বাঙালি ব্যবসায়ীর এ সততায় পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা মুগ্ধ হলেন। এতে তিনি তাদের বিশ্বাসভাজন হন এবং যে কোনো পরিমাণ সুতা তাদের নিকট থেকে ধারে ক্রয় করতে পারতেন। পরবর্তীকালে তিনি যে কল-কারখানা স্থাপন করেন তাতেও তাদের সক্রিয় পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছেন।

গুলবক্স ভুঁইয়া দেখলেন মুড়াপাড়া এলাকায় তাঁতীরা যে কাপড় তৈরি করে তা ইস্ত্রি করার জন্য অত্র এলাকায় কোন প্ল্যান্ট নেই। অসাধারণ ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন গুলবক্স ভুঁইয়া এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মুড়াপাড়ায় একটি ক্যালেন্ডারিং প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। একই বছর তিনি মুড়াপাড়ায় গাউছিয়া কটন স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড স্থাপন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি জাপান থেকে ১২,৫০০ তাঁত আমদানি করেন। ১৯৬১ সালে এর সাথে ১৭৫টি লুম যোগ করেন। সে সময় এই মিলে প্রায় সাতশ শ্রমিক কাজ করত। গুলবক্স ভুঁইয়ার ব্যবসায় এ পর্যায়ে এসে বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তী ছয় সাত বছরে তিনি আরও তিনটি মিলের মালিক হন। তিনি ছিলেন বাঙালি মিল মালিকদের মধ্যে পাইওনিয়ার (অগ্রগামী)। ১৯৬৫ সালে গাউছিয়া কটন মিলের পাশে তিনি গাউছিয়া জুট মিলস্ স্থাপন করেন। এ মিলে তখন প্রায় এক হাজার দু'শ লোকের কর্মসংস্থান হয়। ১৯৬৮ সালে তিনি তৎকালীন ইপিআইডিসি (East Pakistan Industrial Development Corporation) এর নিকট থেকে কালিগঞ্জ মসলিন কটন মিলস্ লিমিটেড ক্রয় করেন। একই বছর তিনি ডেমরাতে আহমদ সিল্ক মিলস্ লিমিটেড ক্রয় করেন। গুলবক্স ভুঁইয়া অনেক সামাজিক সংস্থার কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি এক সময় নারায়ণগঞ্জ সুতা ব্যবসায়ী সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৬০ সালে তিনি পিতার নামে হাজী এলাহী বক্স দাতব্য চিকিৎসালয়

প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া মুর্তজাবাদ দারুল উলুম মাদ্‌রাসারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৮ সালে তিনি তখনকার "তমঘায়ে পাকিস্তান" খেতাবে ভূষিত হন।

তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন। কঠোর পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায়, সততা ও ব্যবসায়িক বুদ্ধি বলে আমাদের দেশে যে ক'জন শিল্পোদ্যোগী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন হাজি গুলবক্স ভুঁইয়া তাদের অন্যতম। তাঁর জীবন থেকে আমাদের তরুণ উদ্যোক্তাদের অনেক কিছুই শেখার রয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৭ জুলাই এ সফল শিল্পপতি ৬২ বছর বয়সে নারায়ণগঞ্জের নিজ বাড়িতে পরলোক গমন করেন।

৩.৮.৩ জুহুরুল ইসলাম

বাংলাদেশে সফল উদ্যোক্তাদের মধ্যে জুহুরুল ইসলাম অন্যতম। ব্যবসায় প্রতিভা, কঠোর পরিশ্রম, অফুরন্ত সৃজনশীলতা ও অদম্য মানসিক দৃঢ়তাসম্পন্ন এ লোকটি আমাদের ব্যবসায়-শিল্পজগতে এক অতি পরিচিত নাম। জুহুরুল ইসলাম ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানাধীন ভাগলপুর গ্রামে এক সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আফতাব উদ্দিন। আফতাব উদ্দিন সাহেব ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের একজন ছোট কন্ট্রাকটর। ১৯৪৫ সালে কলিকাতার রিপন হাই স্কুল থেকে জুহুরুল ইসলাম ম্যাট্রিক পাশ করেন। এ বিখ্যাত শিল্পপতির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাফল্য অবশ্য এখানেই শেষ। পারিবারিক আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তাকে চাকরি সন্ধান করতে হয়। ১৯৪৮ সালে সি এন্ড বি ডিপার্টমেন্টে ওয়ার্ক সরকারের পদে মাত্র সাতাত্তর টাকা বেতনে তিনি চাকরি নেন। কিছুদিন পর তিনি এ বিভাগে লোয়ার ডিভিশন কেরানির (নিম্নমান সহকারী) পদ লাভ করেন। কিন্তু শুরু থেকে তিনি চাকরিকে একমাত্র পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। চাকরির পাশাপাশি তিনি ছোটখাটো ব্যবসায় করার চেষ্টা চালান। কিন্তু চাকরি ও ব্যবসায় একসঙ্গে চলতে পারে না। ১৯৫১ সালে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন এবং একজন তৃতীয় শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে নিজের নাম তালিকাভুক্ত করে কন্ট্রাকটরি ব্যবসায় নেমে পড়েন। এ সময় তাঁর পুঁজির পরিমাণ ছিল তিন/চার হাজার টাকা। ব্যবসায়ের অসাধারণ আগ্রহ, উচ্চাকাঙ্খা, পরিশ্রমের ফলে তিনি পরবর্তীতে একজন সার্থক শিল্পোদ্যোক্তা ও অন্যতম ধনী ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৫৩ সালের মধ্যেই তিনি পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণী ও পরে প্রথম শ্রেণীর কন্ট্রাকটর হিসেবে তালিকাভুক্ত হন।

নিত্য নতুন লাইনে কাজ করার আগ্রহ ও সাহস ছিল তার অসাধারণ। নির্মাণ বিষয়ক সকল কাজই তিনি করতেন। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝিতে তিনি এ ব্যবসায় থেকে প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। জমি কেনার প্রতি তাঁর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল। ঢাকা শহর ও শহরতলিতে প্রচুর জমি ক্রয় করেন। তিনি প্রথম তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ও পরে বাংলাদেশে প্রথম Real Estate ব্যবসায় শুরু করেন। ষাটের দশকে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে শিল্পায়নের এক নব প্রচেষ্টা শুরু হয়। জুহুরুল ইসলাম এ সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। ১৯৬০ সালের দিকে তিনি চট্রগ্রামে একটি টিম্বার ফ্যাক্টরী ও ঢাকায় জিঞ্জিরায় একটি গ্লাস ফ্যাক্টরী স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসায় আরও সাফল্য ও প্রসার লাভ করতে থাকে। বর্তমানে তাঁর মালিকানায় যে সকল প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে সেগুলো একত্রে "বেঙ্গাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড" ও "ইসলাম গ্রুপ অব কোম্পানীজ" নামে পরিচিত। এর আওতায় রয়েছে মিলনারস লিমিটেড, ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড, নাভানা লিমিটেড, এসেনশিয়াল প্রোডাক্টস লিমিটেড, ঢাকা ফাইবার্স লিমিটেড, ক্রিসেন্ট ইন্টারন্যাশনালস লিমিটেড, নাভানা স্পোর্টর্স লিমিটেড, ঢাকা রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড, আফতাব অটোমোবাইলস লিমিটেড ইত্যাদি। এছাড়া তিনি তিনটি জুট মিল ও জুট মিলের যন্ত্রাংশ তৈরির সর্ববৃহৎ কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক কর্মচারি নিয়োজিত আছে। তিনি বহু অনাথ আশ্রম, শিশু প্রতিষ্ঠান, মাদ্‌রাসা ও স্কুল স্থাপন করেন। বাজিতপুরে অবস্থিত বেসরকারি উদ্যোগে দেশের সর্ববৃহৎ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৯৫ সালের ১৯ অক্টোবর তারিখে এ সফল উদ্যোক্তা ৬৭ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। কঠোর পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায়, সৃজনশীল চিন্তা ও একাগ্রতা যে মানুষকে বড় করে জুহুরল ইসলাম তার একটি অনন্য উদাহরণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আত্মকর্মসংস্থানে সফল হওয়ার জন্য আবশ্যক –

ক. সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

খ. সঠিক উদ্যোগ ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস

গ. অধিক সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন

ঘ. সুস্পষ্ট ধারণা সম্বলিত পথ নির্দেশনা

২। আত্মকর্মসংস্থান বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে। এর অন্যতম কারণ–

ক. চাকরির ব্যবস্থা করতে না পারা

খ. আত্ম-মর্যাদা ও প্রভাব বৃদ্ধির জন্য

গ. স্বল্প সময়ে অধিক অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

দক্ষ উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় দেশে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, বেড়ে যায় বিনিয়োগের সুযোগ। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হয়। উদ্যোক্তারা স্বল্প ব্যয়ে ও প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখেন।

একজন উদ্যোক্তা দেশের উন্নয়নে কী করেন ?

ক. নতুন নতুন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করেন

খ. বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করেন

গ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন

ঘ. শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন

৪। কীভাবে প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ?

ক. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে

খ. দেশের শিল্প ও ব্যবসায় সম্প্রসারণ করে

গ. অধিক হারে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে

ঘ. সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে

সৃজনশীল প্রশ্ন

ফরিদ বি. কম. পাস করে প্রায় ১/২ বৎসর চেষ্টা করেও চাকরি না পাওয়ায়, সাভার জাতীয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে হাঁস-মুরগি পালনের উপর তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর ঐকান্তিক চেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, বিচক্ষণতা আর অধ্যবসায়ের ফলে গ্রামে নিজেদের জমিতে হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এলাকায় খামারি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। এ থেকে তিনি বছরে ২/৩ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। বর্তমানে ফরিদ তাঁর ব্যবসায় আরও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণের জন্য আবেদন করেছেন এবং নতুনভাবে পরিকল্পনা করছেন।

ক. আত্মকর্মসংস্থান কী ?

খ. আত্মকর্মসংস্থানের ২টি গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

গ. আত্মকর্মসংস্থানে সফল হতে হলে কী কী গুণাবলী থাকা দরকার তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফরিদের বর্তমান ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর?

চতুর্থ অধ্যায়

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠন
Wonership Based Business Organisation

৪.১ ব্যবসায় সংগঠন কাকে বলে (What is Business Organisation)

একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন একাধিক ব্যক্তি সমবেত হয় এবং ধারাবাহিকভাবে সেই লক্ষ্য অর্জনের কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকে, তখন তাকে সংগঠন বলে। এই সংগঠন কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকলে তাকে ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়েরই সাধারণ লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। এই মুনাফা অর্জন সম্পদ ব্যবহারের দ্বারা পণ্য বা সেবা উৎপাদন করে তা বাজারজাত করার মাধ্যমে করা হয়। এই লক্ষ্যে যখন একাধিক ব্যক্তি সমবেত হয় ও যার যার কাজ ধারবাহিকভাবে সম্পাদনে নিয়োজিত থাকে তখন তা হয় ব্যবসায় সংগঠন।

৪.২ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠন (Different Forms of Business Organisation)

ব্যবসায় জগতে বিভিন্ন প্রকার সংগঠন বিদ্যমান। সমাজবদ্ধ মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় সংগঠনের উদ্ভব হয়। মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠনগুলো নিম্নরূপ :

(১) একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন

(২) অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন

(৩) কোম্পানি সংগঠন

(৪) সমবায় সংগঠন এবং

(৫) রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংগঠন

৪.২.১ একমালিকানা সংগঠন (Sole Proprietorship)

৪.২.১.১ সংজ্ঞা (Definition)

একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রাচীনতম ব্যবসায় সংগঠন। ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে প্রথমেই এর জন্ম। নামকরণ থেকেই বোঝা যায়, এরূপ ব্যবসায়ের মালিক একজন। অর্থাৎ যে ব্যবসায়ের মাত্র একজন মালিক থাকে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন বলে। এ জাতীয় ব্যবসায়ে মালিক নিজেই পুঁজির যোগান দেয়। সে একাই যাবতীয় ঝুঁকি গ্রহণ করে এবং পরিচালনার দায়-দায়িত্ব বহন করে। ব্যবসায়ে লাভ হলে মালিক নিজেই সমুদয় মুনাফা ভোগ করে এবং লোকসান হলে তাকেই তা বহন করতে হয়। মালিকই ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা, সংগঠক, পুঁজি সরবরাহকারী ও পরিচালক। প্রয়োজনে মালিক একাধিক কর্মচারি নিয়োগ করতে পারে। আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের পৃথক কোন সত্তা নেই। এরূপ ব্যবসায় গঠনে তেমন কোন আইনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় না। এ ব্যবসায়ের আয়তনও সাধারণত ছোট হয়ে থাকে। সাধারণত মুদি দোকান, চায়ের দোকান, বিভিন্ন পণ্যের খুচরা দোকান, ছোট ছোট শিল্প-কারখানা প্রভৃতি একমালিকানা ব্যবসায়ের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে। গ্লস ও বেকার নামক দু'জন পন্ডিত ব্যক্তি একমালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এক ব্যক্তির মালিকানায় এবং তার লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে থাকে।"

পূর্ব পৃষ্ঠার আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যবসায় এক ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তা-ই একমালিকানা ব্যবসায়।

৪.২.১.২ একমালিকানা সংগঠনের গঠনপ্রণালি (Formation of Sole Proprietorship)

একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। ইচ্ছা করলে যে কোনো ব্যক্তি স্বল্প কিছু অর্থ সংগ্রহ করে তা গঠন করতে পারে। এ ব্যবসায় গঠনে আইনের তেমন কোনো বিধি-নিষেধ মানতে হয় না। ব্যক্তিগত উদ্যোগই ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য যথেষ্ট। গ্রাম-গঞ্জে যে কোনো লোক ইচ্ছা করলেই একক মালিকানার ভিত্তিতে হাটে বাজারে বা রাস্তার পাশে ছোটখাট ব্যবসায় শুরু করতে পারে। তবে শহর এলাকায় হলে উদ্যোক্তাকে পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয় এবং এরপরই একমালিকানা ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। আমাদের দেশের গ্রাম ও শহর অঞ্চলের অধিকাংশ খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একক মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

৪.২.১.৩ একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Features of Sole Proprietorship)

নিচে একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হল :

১। একমালিকানা : একমালিকানা ব্যবসায় সর্ব অবস্থাতেই একজন মাত্র মালিক থাকে। মালিক এ ব্যবসায়ের উদ্যোক্তা, সংগঠক, পরিচালক ও স্বত্বাধিকারী।

২। গঠন : এ জাতীয় ব্যবসায় সহজেই গঠন করা যায়। যে কোনো ব্যক্তি, যে কোনো সময়ে, প্রয়োজনীয় পুঁজি নিয়ে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। এ প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন করতে কোনো আইনানুগ আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না।

৩। স্বল্প মূলধন : স্বল্প মূলধন নিয়েই এ ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। মালিক নিজেই এ মূলধন সরবরাহ করে থাকে। নিজস্ব সঞ্চয় এবং প্রয়োজনে নিজ দায়িত্বে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে মালিক মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে।

৪। ব্যবসায়ের আয়তন : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একমালিকানা ব্যবসায় ক্ষুদ্র আকারের হয়ে থাকে। মূলধনের স্বল্পতা ও এক ব্যক্তির পরিচালনা ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা এ জাতীয় ব্যবসায়কে ক্ষুদ্রায়তনের হতে বাধ্য করেছে।

৫। একক ঝুঁকি : ব্যবসায়ের সকল প্রকার ঝুঁকি মালিককে এককভাবে বহন করতে হয়। মালিকই ব্যবসায়ের প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। তাই এর বিফলতার সমুদয় ঝুঁকি এককভাবে তাকেই বহন করতে হয়।

৬। আইনগত সত্তা : আইনের চোখে একমালিকানা ব্যবসায়ের পৃথক কোনো সত্তা নেই। মালিক ও ব্যবসায় এক ও অভিন্ন সত্তার অধিকারী। তাই মালিক ও তার ব্যবসায়কে পৃথক করে দেখা হয় না।

৭। দায়-দায়িত্ব : ব্যবসায়ের পুরো দায়-দায়িত্ব মালিককেই বহন করতে হয়। সকল প্রকার কাজ ও দায়-দেনার জন্য সে একাই দায়ী থাকে। তার এ জাতীয় দায় অসীম। প্রয়োজনে তাকে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে ব্যবসায়ের দেনা পরিশোধ করতে হয়।

৮। পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান : ব্যবসায় পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ মালিক নিজেই করে থাকে। ক্রয়-বিক্রয়, আয়-ব্যয়, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি তাকে দেখাশুনা করতে হয়। অবশ্য প্রয়োজনে এসব ব্যাপারে মালিক বেতনভুক্ত কর্মচারির সাহায্য নিয়ে থাকে।

৯। লাভ-লোকসান : একমাত্র মালিক বলে তার লাভ-লোকসানের কোনো অংশীদার নেই। তাই, লাভ হলে তা সে একাই ভোগ করে, তেমনি লোকসান হলে সে নিজেই তা বহন করে।

১০। স্থায়িত্ব : এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব মালিকের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসায় চালানো বা বন্ধ করা তার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে।

৪.২.১.৪ একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা (Advantages of Sole Proprietorship)

একমালিকানা ব্যবসায় কতকগুলো বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। এ সব বিশেষ সুবিধার জন্য বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি আজও এ ব্যবসায় সাফল্যের সঙ্গে টিকে রয়েছে। নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল :

১। সহজ গঠন : একমালিকানা ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। আয়তনে ক্ষুদ্র ও আইনের আনুষ্ঠানিকতা না থাকায় স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে।

২। মালিকের স্বাধীনতা : একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক নিজেই নিজের কর্তা। মালিক নিজ ইচ্ছামত যে কোনো বৈধ ব্যবসায় করতে পারে।

৩। মুনাফা ভোগ : ব্যবসায়ে মুনাফা হলে মালিক একাই তা ভোগ করে থাকে। এতে তার কোনো ভাগিদার নেই। তাই এরূপ ব্যবসায় ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণা ও উদ্যম অনেক বেশি থাকে। ফলে এ ব্যবসায়ে সাফল্যের সম্ভাবনা অধিক। স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের এটি একটি অন্যতম পন্থা। তাই স্বাধীনচেতা ব্যক্তির নিকট একমালিকানা ব্যবসায় সর্বকালেই আশীর্বাদস্বরূপ।

৪। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা : মালিক নিজেই ব্যবসায়ের সকল কাজ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকায় সে ব্যবসায়ের সার্বিক উন্নয়নে অত্যন্ত যত্নবান থাকে। ফলে ব্যবসায়ে শৃঙ্খলা বিরাজ করে, ক্রেতাদের সঙ্গে মালিকের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এর দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়।

৫। অপচয় হ্রাস : ব্যবসায় পরিচালনায় মালিক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে। সে সীমিত পুঁজির সদ্ব্যবহার, অপচয় হ্রাস ও ব্যয় সংকোচনের প্রতি লক্ষ্য রাখে। ফলে ব্যবসায়ের আয় বৃদ্ধি পায়।

৬। আত্মকর্মসংস্থান ও ব্যক্তিগত যোগ্যতা প্রদর্শন : স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করা যায়। এ ধরনের ব্যবসায় বিপুল জনগোষ্ঠীকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করে। তাছাড়া একমালিকানা ব্যবসায় ব্যক্তিগত শিল্প নৈপুণ্য ও কুশলতা প্রদর্শনেরও একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র।

৭। দ্রুত সিদ্ধান্ত : এরূপ ব্যবসায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মালিকই একমাত্র কর্তা। তাকে অন্য কোনো ব্যক্তির মতামত বা অনুমোদন নিতে হয় না। ফলে যে কোনো সিদ্ধান্তই অতি দ্রুত কার্যকর করা তার পক্ষে সম্ভব হয়।

৮। গোপনীয়তা : ব্যবসায়ের কৃতকার্যতা অনেক সময় কতগুলো গোপন কৌশলের ওপর নির্ভর করে। এরূপ কৌশল প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার শক্তি বৃদ্ধি করে। মালিক নিজেই ব্যবসায়ের সকল কাজ দেখাশুনা করে। ফলে তার পক্ষে ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল বিষয়েই গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব।

৯। অবস্থানগত সুবিধা : একমালিকানা ব্যবসায় গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, রাস্তার পার্শ্বে বা বড় বড় শহরের যে কোনো স্থানেই স্থাপন করা সম্ভব। এ ধরনের অবস্থানগত সুবিধা অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনগুলো সাধারণত পায় না।

১০। নমনীয়তা : এ জাতীয় ব্যবসায় অত্যন্ত নমনীয়। পরিবর্তিত অবস্থা ও চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য সহজেই ব্যবসায়ের নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন করা যায়। এ অবস্থা ব্যবসায়ের সাফল্য নিশ্চিত করে।

৪.২.১.৫ একমালিকানা সংগঠনের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of a Sole Proprietorship)

একমালিকানা ব্যবসায়ের যে অনেক সুবিধা রয়েছে তা আমরা জেনেছি। কিন্তু, এ ব্যবসায় যে অবিমিশ্র সুবিধাই ভোগ করে তা নয়। এর কতগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল :

১। মূলধনের স্বল্পতা : মূলধনের স্বল্পতা একমালিকানা ব্যবসায়ের একটি বড় অসুবিধা। ব্যক্তি বিশেষের পুঁজি যোগানোর ক্ষমতা সীমিত। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে এরূপ ব্যবসায় নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

২। অসীম দায় : একমালিকানা ব্যবসায়ের দায় অসীম। ব্যবসায়ের যাবতীয় দায়-দেনার জন্য মালিক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। প্রয়োজনবোধে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে ব্যবসায়ের দায়-দেনা পরিশোধ করতে হয়।

৩। ব্যক্তিগত সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা : এক ব্যক্তি যত দক্ষতাসম্পন্নই হোক না কেন, তার কর্মশক্তির একটি সীমা রয়েছে। তাছাড়া তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সামর্থ্য স্বভাবতই সীমিত। এ কারণে তাকে ব্যবসায় সম্প্রসারণের অসুবিধাসহ নানাবিধ বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

৪। অধিক ব্যক্তিগত ঝুঁকি : ভবিষ্যৎ উন্নতির প্রত্যাশায় মানুষ বর্তমানে ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সব সময়ই অনিশ্চিত। কাজেই, তাকে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ক্ষতির ঝুঁকি বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ক্ষতি হলে তার সবটাই তাকে একাকি বহন করতে হয়।

৫। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত : একমালিকানা ব্যবসায় বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা হতে বঞ্চিত। মূলধনের স্বল্পতা, একজন মালিকের পরিচালনা, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে এর মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় না।

৬। আইনগত স্বীকৃতির অভাব : একমালিকানা ব্যবসায়ের আইনগত কোন সত্তা নেই। মালিকের সত্তা নিয়েই এটি পরিচিত। কাজেই, এর ওপর জনগণের আস্থা কম।

৭। স্থায়ীত্বের অভাব : একমালিকানা ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মালিকের ত্রুটি-বিচ্যুতি, মৃত্যু, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ও খেয়াল-খুশি অনুযায়ী ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।

৪.২.১.৬ একমালিকানা সংগঠনের উপযোগী ক্ষেত্রসমূহ (Areas of Suitable for Sole Proprietorship)

একমালিকানা ব্যবসায়ের কতগুলো অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উন্নত ও অনুন্নত প্রায় সকল দেশেই এর জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়। ব্যবসায় সংগঠনগুলো যেমন– একমালিকানা, অংশীদারি, যৌথমূলধনী ও সমবায় সংগঠন সকল ব্যবসায়ের জন্য সমভাবে উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। ব্যবসায়ের স্বকীয় কতগুলো বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেক প্রকার ব্যবসায়ের কোনো না কোনো উপযোগী ক্ষেত্র রয়েছে। স্বল্প পুঁজির সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তনের কম ঝুঁকিপূর্ণ ও স্থানীয়ভাবে গঠন করা যায় এমন ব্যবসায়ের জন্য একমালিকানা খুবই উপযোগী, যেমন– ছোট হোটেল, লন্ড্রী, মুদি দোকান, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রভৃতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়, কৃষি ও পচনশীল পণ্য এবং প্রতিনিয়ত রুচি ও ফ্যাশন পরিবর্তন হয় এমন পণ্যের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় খুবই উপযোগী। তাছাড়া ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শন করার মত ব্যবসায়, পেশাদারি ও প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন–দর্জিগিরি, ফটোগ্রাফি, সেলুন, লন্ড্রি, মেরামত কারখানা, ওষুধের দোকান, আইন ব্যবসায়, ডাক্তারি প্রভৃতি একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। সর্বোপরি ভোক্তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে এরূপ ব্যবসায়, যেমন– কনফেকশনারি, বিভিন্ন ধরনের খুচরা ব্যবসায় একক মালিকানা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে থাকে।

সবশেষে বলা যায়, স্বল্প পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগ করে কম ঝুঁকিতে যে কোনো স্থানে স্থাপন করা যায় এমন সব কাজের জন্যই একমালিকানা ব্যবসায় বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হয়।

৪.২.২ অংশীদারি সংগঠন (Partnership Organisation)

৪.২.২.১ সংজ্ঞা (Definition)

অংশীদারি সংগঠন একাধিক ব্যক্তির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়ে যখন কোনো বৈধ ব্যবসায় স্থাপন করে তখন তাকে অংশীদারি সংগঠন বলে। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। অংশীদাররা ব্যবসায় করার জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ চুক্তিই হল অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি। চুক্তিতে মূলধন সবরবাহ, লাভ-লোকসান বণ্টনের অনুপাত ও ব্যবসায় পরিচালনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবন্ধ থাকে। যে সকল ব্যক্তি পরস্পরের মধ্যে এরূপ চুক্তিবন্ধ সম্পর্কে আবন্ধ হয় তাদেরকে অংশীদার বলে। আর তাদের দ্বারা গঠিত ব্যবসায়কে বলা হয় অংশীদারি সংগঠন। সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য-সংখ্যা ২ থেকে ২০ জনের মধ্যে সীমাবন্ধ। কিন্তু ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ১০ জন। অংশীদাররা ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান দেয়। সকলে অথবা সকলের মধ্য থেকে যে কেউ ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে। তারা চুক্তি অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান বণ্টন করে। বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইনের ৪ ধারা অনুসারে “সকলের দ্বারা বা সকলের পক্ষ হতে একজনের দ্বারা পরিচালিত ব্যবসায়ের মুনাফা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার জন্য কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে যে চুক্তিবন্ধ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে”।

৪.২.২.২ অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালি (Formation of Partnership Business)

অংশীদারি ফার্ম গঠন করা বেশ সহজ। এতে আইনের তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয় না। কয়েকজন সাবালক ও সুস্থ ব্যক্তি (সাধারণ অংশীদারি ব্যবসায়ে ২ থেকে ২০ জন এবং ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ে ২ থেকে ১০ জন) একটি ব্যবসায়ভিত্তিক চুক্তি সম্পাদন করে অংশীদারি প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারে। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক অথবা লিখিত উভয়ই হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি, বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি এড়ানোর জন্য চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্চনীয়। চুক্তির বলেই অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হয়। এজন্য বলা হয়, চুক্তিই অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি। চুক্তি অনুযায়ী অংশীদাররা যে কোনো অনুপাতে ব্যবসায়ের মূলধন যোগান দেয়। অন্যান্য সকল অংশীদারের সম্মতি থাকলে কোনো ব্যক্তি মূলধন সরবরাহ না করেও অংশীদারের মর্যাদা পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির ব্যবসায়িক দক্ষতা, সুনাম প্রভৃতি ব্যবসায়ের মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।

অংশীদারি ফার্মের কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। অংশীদারদের সত্তা নিয়েই এর অস্তিত্ব বজায় থাকে। অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায়িত্ব থাকে অসীম। অংশীদারি ফার্মের দেনার জন্য তাদেরকে যৌথভাবে ও এককভাবে দায়ী থাকতে হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। নিবন্ধন ছাড়াই অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠিত ও পরিচালিত হতে পারে। তবে নিবন্ধন আকর্ষণীয় করার জন্য নিবন্ধিত ফার্মকে কতগুলো বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকার দেওয়া হয় যা অনিবন্ধিত ফার্মকে দেওয়া হয় না। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধন করতে হলে নিবন্ধকের নিকট নির্ধারিত ফী বা মাসুলসহ আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রে ফার্মের নাম, ব্যবসায়ের স্থল, অংশীদারদের নাম ও ঠিকানা, তাদের যোগদানের তারিখ, ফার্মের মেয়াদ প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়। আবেদনপত্রটি সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। আবেদনপত্রের বিবৃতি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে নিবন্ধক ফার্মটি রেজিস্ট্রিভুক্ত করেন। ব্যবসায় আরম্ভ করার পূর্বে অংশীদারি ফার্মকে পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। এরপর অংশীদারি ফার্ম ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

৪.২.২.৩ অংশীদারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Features of Partnership Business)

অংশীদারি ব্যবসায়ের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিচে এগুলো আলোচনা করা হল :

১। চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক : অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদারদের মধ্যকার একটি চুক্তির ফল। চুক্তির মাধ্যমেই এর সৃষ্টি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। এ চুক্তি মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। তবে ভবিষ্যতে মামলা-মোকদ্দমা ও ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্য চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

২। সহজ গঠন : অংশীদারি ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ। প্রাপ্ত বয়স্ক একাধিক ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করে এরূপ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। এজন্য কোনো আইনগত জটিলতা নেই। তবে ব্যবসায়টি অবশ্যই বৈধ হতে হবে।

৩। সদস্য-সংখ্যা : বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা ন্যূনতম দুই জন ও সর্বাধিক বিশ জন। তবে ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সদস্য সংখ্যা দশ জনের অধিক হতে পারে না।

৪। মূলধন সরবরাহ : অংশীদাররা চুক্তি অনুযায়ী যেকোনো অনুপাতে ব্যবসায়ের মূলধনের যোগান দিয়ে থাকে। এমনকি অন্যান্য সব সদস্যদের সম্মতিক্রমে কোনো ব্যক্তি মূলধন বিনিয়োগ না করে তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সুনামের বিনিময়েও অংশীদারের মর্যাদা পেতে পারে।

৫। সীমাহীন দায় : অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের দায় অসীম। অর্থাৎ অংশীদারদের দায় ব্যবসায় তাদের বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দায়-দেনা পরিশোধে ব্যবসায়ের সম্পত্তি অপর্যাপ্ত হলে তারা তাদের ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে অবশিষ্ট দেনা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

৬। আইনগত সত্তা : আইনত অংশীদারি ব্যবসায়ের পৃথক কোনো অস্তিত্ব বা সত্তা নেই। এ ধরনের ব্যবসায়কে কতিপয় ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে দেখা হয়। ফলে এটি নিজের নামে কোনো চুক্তি বা মামলা করতে পারে না। অংশীদারদের নামেই কোনো চুক্তি বা মামলা করতে হয়।

৭। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস : অংশীদারি ব্যবসায় পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় এবং এ বিশ্বাস বলেই ব্যবসায় টিকে থাকে। অংশীদাররা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে একে অন্যের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

৮। লাভ-লোকসান বণ্টন : চুক্তির শর্ত অনুসারে অংশীদারদের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টন করা হয়। তবে চুক্তিতে এ বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে মুনাফা সকল সদস্যের মধ্যে সমহারে বণ্টন করতে হয়।

৯। পরিচালনা : আইন অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনায় সকল অংশীদারই অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে ব্যবসায় পরিচালনার ভার কোনো এক বা একাধিক অংশীদারের ওপর অর্পণ করা যেতে পারে।

১০। স্থায়িত্ব : অংশীদারি ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অংশীদারদের ওপরই নির্ভরশীল। যে কোনো সময় অংশীদাররা ব্যবসায়ের বিলোপসাধন ঘটাতে পারে। তাছাড়া কোনো অংশীদারের মৃত্যু, অংশ হস্তান্তর, মস্তিষ্ক বিকৃতি, আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্তি ও দেউলিয়া হওয়ার কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলুপ্তি ঘটানো যেতে পারে।

৪.২.২.৪ অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠনের সুবিধা (Advantage of Partnership Business Organisation)

একমালিকানা থেকে অংশীদারি সংগঠন কিছুটা বড় আয়তনের হওয়াতে এটি কতগুলো বিশেষ সুবিধা ভোগ করে। নিচে এর উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল :

১। ব্যবসায়ের গঠন সহজসাধ্য : অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন অত্যন্ত সহজ। এতে আইনগত তেমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। চুক্তিতে আবদ্ধ হতে সক্ষম এমন কতিপয় ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়েই এরূপ ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

২। অধিক পুঁজি সংগ্রহ : অংশীদাররা মিলিতভাবে মূলধন সরবরাহ করে। তাই ব্যবসায় কিছুটা অধিক পুঁজির সমাবেশ ঘটে।

৩। বিভিন্ন যোগ্যতার সমাবেশ : অংশীদারি ব্যবসায়ে একাধিক ব্যক্তি সমবেত হয়। এদের কারও প্রচুর অর্থ রয়েছে। আবার কারও পুঁজি নেই, কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার অন্যান্য দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিভিন্ন যোগ্যতার সমাবেশ ঘটে বলে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়।

৪। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা : অংশীদারি ব্যবসায়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পুঁজি ও দক্ষতার সমাবেশ ঘটে। ফলে এর মাধ্যমে কিছুটা বড় ধরনের ব্যবসায় সংগঠন করা সম্ভব হয়।

৫। দক্ষ পরিচালনা : শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করেই অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়ের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অপর্ণ করা হয়। যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেকে ব্যবসায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বলেই অংশীদারি ব্যবসায় দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়।

৬। ঝুঁকি বণ্টন : ব্যবসায়ের কাজ অংশীদাররা যোগ্যতা অনুযায়ী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। তাছাড়া লাভ-ক্ষতি চুক্তির শর্ত অনুসারে সকলের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কাজেই, ব্যবসায়ের ঝুঁকি সকল অংশীদারের মধ্যে বণ্টিত হয়।

৭। অধিক ব্যবসায়ী সংযোগ : ব্যবসায়ের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা আবশ্যক। অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা অধিক। ফলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৃহত্তর গণসংযোগ গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জন সহজ হয়।

৮। অসীম দায়ের জন্য সতর্কতা : অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রত্যেক অংশীদারেরই দায় অসীম। এজন্য তারা বিশেষ সাবধানতা ও সতর্কতার সঙ্গে ব্যবসায় পরিচালনা করে। ফলে ব্যবসায় ঝুঁকির বা ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

৯। যৌথ সিদ্ধান্ত : অংশীদাররা সমবেতভাবে ব্যবসায়ের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সব সময়ই দুই জনের বুদ্ধি একজন অপেক্ষা উত্তম। ফলে আলাপ-আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

১০। নমনীয়তা : অংশীদারদের মতামত গ্রহণের মাধ্যমে সহজেই ব্যবসায়ের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংকোচন সাধন করা যায়। ফলে এ ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সহজেই বাজারের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে।

৪.২.২.৫ অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধা (Disadvantage of Partnership Business)

অংশীদারি ব্যবসায়ের নানাবিধ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল :

১। অপ্রতুল মূলধন : এ কথা সত্য যে, অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অপেক্ষা অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব। তবে এ অর্থ আধুনিক বৃহদাকার ব্যবসায় গড়ে তোলার জন্য নিতান্তই অপ্রতুল।

২। অসীম দায় : অসীম দায় ব্যবসায়ের একটি অন্যতম অসুবিধা। ব্যবসায়ের দায়-দেনার জন্য অংশীদারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও দায়গ্রস্ত হতে পারে। তাছাড়া একজন ব্যতীত অন্যসব অংশীদার দেউলিয়া হয়ে গেলে তাকেই ব্যবসায়ের সকল দেনা পরিশোধ করতে হয়। এজন্য অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তিরা এ ব্যবসায়ে যোগ দিতে চায় না।

৩। অনিশ্চিত স্থায়িত্ব : এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্বের বড়ই অভাব। অংশীদারদের মতানৈক্য, কোনো অংশীদারের মস্তিষ্ক বিকৃতি বা দেউলিয়াপনা বা মৃত্যু এ ব্যবসায়ের অবসান ঘটাতে পারে। তাছাড়া যে কোনো অংশীদারের ইচ্ছাই ব্যবসায়ের বিলুপ্তির জন্য যথেষ্ট।

৪। দ্রুত সিদ্ধান্তের অভাব : ব্যবসায় সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্তের জন্য সকল অংশীদারের মতামত প্রয়োজন। ফলে অতি জরুরি হলেও কোনো বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয় না।

৫। পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের অভাব : এ ব্যবসায় অংশীদারদের মধ্যকার পারস্পরিক বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ের শুরুতে অংশীদারদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে ও ঘটনাচক্রে এ বিশ্বাসে ফাটল ধরে এবং তাদের মধ্যে অবিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। পরিণতিতে অংশীদারি ব্যবসায় ভেঙে যায়।

৬। পরিচালনায় বিঘ্ন : সকল সদস্যেরই ব্যবসায় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকে। এতে ব্যবসায় পরিচালনায় মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফলে ব্যবসায় পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটে।

৭। জনগণের আস্থার অভাব : অংশীদারি সংগঠনের কোন আইনগত ভিত্তি বা স্বতন্ত্র সত্তা নেই বলে জনগণ এ ব্যবসায়ের ওপর আস্থাবান হতে পারে না।

৮। অসৎ ও অদক্ষ কাজের দায় বহন : একজন অংশীদারের ভুল বা খারাপ কাজের জন্য সকল অংশীদারই দায়বদ্ধ হতে পারে। তার ত্রুটিপূর্ণ ও অসৎ কাজের জন্য পুরো ব্যবসায়ই দায়বদ্ধ হয়ে থাকে।

৯। গোপনীয়তার অভাব : অংশীদারি ব্যবসায় কতিপয় অংশীদার নিয়ে গঠিত হয় বলে অনেক সময় এর ব্যবসায়সুলভ গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। বিশেষত, ব্যবসায়ে নিষ্ঠাবান অংশীদারের অভাব হলে কোনো মতেই এর গোপনীয়তা রক্ষা করা যায় না।

৪.২.২.৬ অংশীদারি সংগঠনের চুক্তিপত্র (Deed of Partnership Organisation)

চুক্তি অংশীদারি ব্যবসায়ের ভিত্তি। চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় গঠিত হতে পারে না। অংশীদারি ব্যবসায় গঠনে আগ্রহী ব্যক্তিরা প্রত্যেকের মূলধন সরবরাহের পরিমাণ, লাভ-লোকসান বণ্টন, ব্যবসায় পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সিদ্ধান্তই অংশীদারি চুক্তি বলে বিবেচিত। চুক্তি অনুযায়ী তারা ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনে এর বিলোপ সাধন ঘটায়।

অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তি লিখিত বা মৌখিক হতে পারে। তবে অংশীদারি চুক্তি লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা প্রয়োজনে মৌখিক চুক্তির কোনো শর্ত নিশ্চিত করে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। লিখিত চুক্তিকে চুক্তিপত্র বলে। অর্থাৎ যে পত্রে/দলিলে অংশীদারি ব্যবসায়ের গঠন, উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, অংশীদারদের অধিকার ও দায়িত্ব প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে তাকে অংশীদারি ব্যবসায়ের চুক্তিপত্র বলে। ভবিষ্যতে অংশীদারদের মধ্যকার ভুল বোঝাবুঝি, কলহ ও বিরোধ এড়ানোর জন্য অংশীদারি ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় সকল বিধান ও শর্ত সাধারণত এ দলিলে উল্লেখ করা হয়। এই চুক্তির আওতায় অংশীদারদের মধ্যকার মতানৈক্য বা বিবাদ মীমাংসা করা হয়। চুক্তিপত্র সকল অংশীদার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়। সকল অংশীদারের সম্মতিক্রমে যে কোনো সময় চুক্তিপত্রের যে কোনো শর্ত পরিবর্তন করা যায়।

৪.২.২.৭ অংশীদারি চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Partnership Deed)

চুক্তিপত্রে উল্লেখ্য বিষয়াবলি সম্পর্কে আইনের তেমন কোনো বিধি-নিষেধ নেই। তবে নির্ধারিত মূল্যের স্ট্যাম্প সংবলিত দলিলে চুক্তির শর্তগুলো লিখে তাতে অংশীদারদের স্বাক্ষর নেওয়া উচিত। একটি আদর্শ অংশীদারি চুক্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকা উচিত :

(১) অংশীদারি ব্যবসায়ের নাম, ঠিকানা ও অবস্থান।

(২) অংশীদারদের সংখ্যা, নাম, ঠিকানা ও পেশা।

(৩) ব্যবসায়ের প্রকৃতি ও সময়কাল।

(৪) ব্যবসায়ের মোট মূলধন, অংশীদারদের দেয় পুঁজির পরিমাণ ও পরিশোধ পদ্ধতি।

(৫) অংশীদারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন ও ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত বিবরণ।
(৬) লাভ-লোকসান বণ্টনের অনুপাত ও পদ্ধতি।
(৭) হিসাব-রক্ষণ ও নিরীক্ষণ পদ্ধতি।
(৮) অংশীদারি ফার্মের ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা।
(৯) ব্যাংক হিসাব পরিচালনাকারীর নাম ও পদবী।
(১০) কোনো অংশীদারকে বহিষ্কার ও নতুন অংশীদার গ্রহণের নিয়মাবলি।
(১১) ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের কারণ ও নিয়মাবলি।

এসব বিষয় ছাড়াও ব্যবসায়ের প্রকৃতিভেদে অংশীদাররা পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষার্থে যে কোনো শর্ত চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

৪.২.২.৮ অংশীদারি চুক্তিপত্রের একটি নমুনা (Specimen of a Partnership Deed)

মেসার্স রহমান-রহিম এন্ড কোং এর অংশীদারি চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ

মোঃ আবদুর রহমান
পিতাঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান
৪৮, গ্রীণ রোড, ঢাকা

দ্বিতীয় পক্ষ

মোঃ আবদুর রহিম
পিতাঃ মাহবুবুর রহমান
৫৪, গ্রীণ রোড, ঢাকা- ১২০৫

আজ ১৬ই জানুয়ারি ২০০৮ ইংরেজি তারিখে উপরের পক্ষদ্বয় নিচে বর্ণিত শর্তাবলির ভিত্তিতে মেসার্স রহমান-রহিম এন্ড কোং নামে একটি অংশীদারি ব্যবসায় সংগঠন গঠনে সম্মত হয় এবং এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে। পক্ষদ্বয় সাবালক, সুস্থ মস্তিষ্ক-সম্পন্ন এবং জন্মগতভাবে বাংলাদেশী।

উভয়পক্ষই চুক্তিপত্রের সকল শর্ত মেনে চলতে আইনত বাধ্য থাকবে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির যে কোনো শর্ত পরিবর্তন করা যাবে।

চুক্তির শর্তাবলি

১। প্রতিষ্ঠানের নাম	:	মেসার্স রহমান-রহিম এন্ড কোং।
২। ব্যবসায়ের ঠিকানা	:	১০, নিউ বেইলী রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
৩। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি	:	পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশ এবং এসবের খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়।
৪। মূলধনের পরিমাণ	:	অংশীদারি ব্যবসায়ের মোট মূলধন আপাতত ৮ ৫০ লক্ষ টাকা। তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে উভয়পক্ষ ঐক্যমত্য হয়ে মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে পারবে।
৫। মূলধন সরবরাহ	:	উভয় অংশীদার সমহারে মূলধন যোগান দিবে।
৬। লাভ-লোকসান বণ্টন	:	ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান উভয়পক্ষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হবে।
৭। ব্যাংকেন নাম, ঠিকানা	:	সোনালী ব্যাংক, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
৮। ব্যাংক হিসাব পরিচালনা	:	উক্ত ব্যাংকে ফার্মের নামে একটি চলতি হিসাব খোলা হবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ জনাব মোঃ আব্দুর রহিম উক্ত হিসাব পরিচালনা করবেন।
৯। হিসাব বছর	:	জানুয়ারি থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে প্রতিষ্ঠানের হিসাব বছর ধরা হবে।
১০। চূড়ান্ত হিসাব	:	প্রতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত হিসাব তৈরি হবে এবং তা নিয়োগকৃত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট দ্বারা নিরীক্ষা করাতে হবে।
১১। হিসাব নিরীক্ষক	:	আজিজ, হালিম এ্যান্ড কোম্পানি, ১০ বিজয়নগর, ঢাকা ফার্মের হিসাব নিরীক্ষক হিসেবে কাজ করবে।
১২। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা	:	উভয় অংশীদারই ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন। তবে প্রথম পক্ষ মোঃ আব্দুর রহমান ব্যবস্থাপনা অংশীদার হিসেবে কাজ করবেন। এজন্য তিনি কোন অতিরিক্ত ভাতা বা পারিশ্রমিক পাবেন না।
১৩। নতুন অংশীদার গ্রহণ	:	উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনবোধে নতুন অংশীদার গ্রহণ করা যাবে।
১৪। অংশীদারের মৃত্যু	:	কোন অংশীদারের মৃত্যু ঘটলে তার আইনানুগ উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করলে চুক্তিবন্ধ হয়ে ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারবে। এতে অবশ্যই অন্যপক্ষের সম্মতি থাকতে হবে।
১৫। পাওনা পরিশোধ	:	মৃত অংশীদারের পাওনা পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্ধারণ এবং ত্রৈমাসিক ছয় কিস্তিতে তা পরিশোধ করতে হবে।
১৬। বিলোপ সাধন	:	ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের প্রয়োজন দেখা দিলে উভয় অংশীদারের সম্মতিক্রমে তা করতে হবে।

আমরা উভয়পক্ষ সজ্ঞানে ও সুস্থ মস্তিষ্কে নিম্নলিখিত সাক্ষীদ্বয়ের সম্মুখে এই চুক্তিনামার শর্তাবলী মেনে নিয়ে স্বাক্ষর প্রদান করলাম।

মোঃ আবদুর রহমান
স্বাক্ষর : ....
তারিখ : ....

মোঃ আবদুর রহিম
স্বাক্ষর : ....
তারিখ : ....

দুই জন সাক্ষীর স্বাক্ষর

১। এ এম চৌধুরী
(আব্দুস সাত্তার চৌধুরী)
এডভোকেট, ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট
১৯, সার্কুলার রোড, ঢাকা

২। এম এইচ তালুকদার
(মোঃ হাসিব তালুকদার)
১০৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা

৪.২.২.৯ অংশীদারি সংগঠনের নিবন্ধন (Registration of Partnership Organisation)

আইন অনুযায়ী অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। এটা সম্পূর্ণ অংশীদারদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। অংশীদারি ব্যবসায় নিবন্ধিত হলে চুক্তিটি আইনসম্মত দলিলে পরিণত হয় এবং নিবন্ধিত ফার্মটি অতিরিক্ত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা পায় যা অনিবন্ধিত ফার্ম পায় না। নিবন্ধন–এর জন্য সরকারের নিযুক্ত রেজিস্ট্রারের অফিসে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। অংশীদাররা আবেদন ফরমটি যথাযথভাবে পূরণপূর্বক তারিখ ও স্বাক্ষর প্রদান করে নিবন্ধকের কাছে দাখিল করে। নিবন্ধনের জন্য অবশ্য একটি নির্ধারিত ফী বা মাসুল প্রদান করতে হয়। আবেদনপত্রে নিম্নের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয়:

(১) অংশীদারি ফার্মের নাম ও ঠিকানা
(২) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি
(৩) ব্যবসায়ের প্রধান কর্মস্থল
(৪) ব্যবসায়ের মেয়াদকাল
(৫) অংশীদারের ব্যবসায়ে যোগদানের তারিখ
(৬) অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ও পেশা

নিবন্ধক আবেদনপত্রের বিবৃতি পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে ফার্মটিকে তালিকাভুক্ত করে নেন। অংশীদারদের নাম, ঠিকানা বা ব্যবসায়ের অবস্থান সংক্রান্ত কোনো পরিবর্তন হলে নিবন্ধককে তা যথাযথভাবে জানাতে হয়। অংশীদারের অবসর গ্রহণ বা বহিষ্কার অথবা ফার্মের বিলোপ সাধন সম্পর্কিত নোটিশপত্রের অনুলিপি অবশ্যই নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয়। তদুপরি সেগুলো সরকারি গেজেট এবং দেশের মাতৃভাষায় প্রকাশিত যে কোনো একটি বহুল প্রচলিত সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে হয়।

৪.২.২.১০ অনিবন্ধিত অংশীদারি সংগঠনের অসুবিধাবলি (Demerits of Unregistered Partnership Organisation)

বাংলাদেশে প্রচলিত ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। তবে নিবন্ধিত হলে সংশ্লিষ্ট ফার্ম ও অংশীদাররা কতগুলো সুবিধা ভোগ করে যা থেকে অনিবন্ধিত ফার্ম বঞ্চিত। আইনে অনিবন্ধিত ফার্মের অংশীদারদের কতগুলো অক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ অক্ষমতাগুলো দূর করার জন্যই অংশীদাররা তাদের ফার্মকে নিবন্ধিত করতে উৎসাহিত হয়। অক্ষমতাগুলো নিম্নরূপ :

১. অনিবন্ধিত ফার্ম চুক্তিগত অধিকার বলবৎ করার জন্য কোনো মামলা বা অন্য কোনো আইনগত প্রক্রিয়ায় সাহায্য নিতে পারে না।

২. অনিবন্ধিত ফার্মের একজন অংশীদার ফার্মের বা তার সহ-অংশীদারের নিকট হতে চুক্তিনামায় প্রদত্ত তার অধিকারসমূহ বুঝে পাওয়ার জন্য মামলা দায়ের করতে পারে না কিন্তু তৃতীয়পক্ষ এরূপ অংশীদারি ফার্ম বা অংশীদারদের বিপক্ষে তার অধিকার বা পাওনা বুঝে পাওয়ার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে।

৪.২.২.১১ অংশীদারি সংগঠনের বিলোপ সাধন (Dissolution of Partnership Organisation)

অংশীদারদের চুক্তিবন্ধ সম্পর্কের অবসানকে বিলোপ সাধন বলে। বিভিন্ন কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করা যায়। নিম্নে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপের কারণগুলো বর্ণনা করা হল:

১. সকলে একমত হয়ে বিলোপ সাধন

২. বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিলোপ সাধন

৩. বিশেষ কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিলোপ সাধন

৪. বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন

৫. আদালতের আদেশ অনুসারে বিলোপ সাধন

১। সকলে একমত হয়ে বিলোপ সাধন :

সকল অংশীদার একমত হয়ে যে কোনো সময়ে অংশীদারি ব্যবসায়ের অবসান ঘটাতে পারে। এ ছাড়া তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করা যায়।

২। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিলোপ সাধন : ঐচ্ছিক অংশীদারি ব্যবসায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলুপ্তি করা যায়। যে কোনো সময় একজন অংশীদার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ফার্মের বিলোপ সাধন ঘটাতে পারে।

৩। বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিলোপ সাধন : নিম্নের যে কোনো কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন ঘটতে পারে:

(ক) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যবসায় গঠিত হলে এবং উক্ত সময় শেষ হয়ে গেলে

(খ) নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য বা কাজের জন্য ব্যবসায় গঠিত হলে এবং তা সম্পন্ন হলে

(গ) কোনো অংশীদার মারা গেলে বা উন্মাদ হলে

(ঘ) কোনো অংশীদার ব্যবসায় থেকে অবসর গ্রহণ করলে

(ঙ) কোনো অংশীদার আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে

৪। বাধ্যতামূলক বিলোপ সাধন : নিম্নের যে কোনো কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের বাধ্যতামূলকভাবে বিলোপ সাধন ঘটানো হয় :

(ক) সকল অংশীদার বা একজন ছাড়া বাকি সবাই দেউলিয়া ঘোষিত হয় অথবা

(খ) কোনো বিশেষ কারণে বা আইন প্রণয়ন করে ব্যবসায়ের কার্যক্রমকে অবৈধ ঘোষণা করা হলে অর্থাৎ কোনো অংশীদারি ব্যবসায় কোনো কারণে আইন বিরুদ্ধ বা অবৈধ হয়ে পড়লে।

৫। আদালতের আদেশ অনুসারে বিলোপ সাধন : নিম্নের যে কোনো কারণে আদালত অংশীদারি ব্যবসায়ের বিলোপ সাধনের আদেশ দিতে পারে।

(ক) কোনো অংশীদার স্থায়ীভাবে পাগল হয়ে গেলে

(খ) কোনো অংশীদার স্থায়ীভাবে কর্তব্য পালনে অক্ষম হলে

(গ) কোনো অংশীদার দেউলিয়া বলে প্রমাণিত হলে

(ঘ) লোকসান ছাড়া ব্যবসায় পরিচালনা অসম্ভব হলে

(ঙ) বেআইনিভাবে কোনো অংশীদার তার সম্পূর্ণ অংশ হস্তান্তর করলে বা তার সম্পূর্ণ অংশ আদালত বুঝে নিলে

(চ) ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনো অংশীদার অসৎ প্রমাণিত হলে

(ছ) আদালত কর্তৃক কোন অংশীদার দন্ডিত হলে

(জ) এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে আদালত ব্যবসায় সংগঠনের বিলোপ সাধন যুক্তিসংগত মনে করলে

৪.২.৩ কোম্পানি সংগঠন (Company Organisation)

৪.২.৩.১ সংজ্ঞা (Definition)

একক মালিকানা ব্যবসায় সংগঠনের প্রাথমিক রূপ। এরূপ সংগঠনে একজন মাত্র মালিক থাকে। পরবর্তীতে অংশীদারি ব্যবসায়ের পত্তন হয়। অংশীদারি ব্যবসায়ে একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটলেও এ সংখ্যা ২০-এর অধিক হতে পারে না। এ ধরনের ব্যবসায় সংগঠনে পুঁজির স্বল্পতা, স্থায়িত্বের অভাব এবং ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা থেকেই যায়। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও শিল্প বিপ্লবের কারণে উৎপাদনের মাত্রা ও ব্যবসায়ের আয়তনের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে অধিকতর পুঁজির প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই মূলধনের স্বল্পতা, অসীম দায়জনিত ঝুঁকি ও স্থায়িত্বের অভাব দূর করে অধিক মূলধন, সীমিত দায় ও আইনগত অস্তিত্ব নিয়ে কোম্পানি সংগঠনের বিকাশ ঘটে। কোম্পানি কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ব্যবসায় সংগঠন। অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে তারা স্বেচ্ছায় তহবিল গঠন করে। যৌথভাবে গঠিত এ তহবিলই কোম্পানির মূলধন। যৌথভাবে তহবিল বা মূলধন সৃষ্টি হয় বলে ব্যবসায়টিকে যৌথ মূলধনী কোম্পানি বলে অভিহিত করা হয়। সদস্যদের দ্বারা সরবরাহকৃত পুঁজিকে শেয়ার মূলধন বলে। এ শেয়ার মূলধন নির্দিষ্ট মূল্যের নির্দিষ্ট সংখ্যক অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে শেয়ার বলে। শেয়ারের একটি আংশিক মূল্য থাকে। যে ব্যক্তি অন্তত একটি শেয়ার ক্রয় করে তাকে শেয়ারহোল্ডার বলে। শেয়ারহোল্ডারই কোম্পানির মালিক। কোম্পানির শেয়ারগুলো হস্তান্তরযোগ্য এবং সদস্যদের দায় শেয়ার মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রয়োজনে শেয়ারহোল্ডাররা শেয়ার বিক্রি করে নগদ অর্থ পেতে পারে। বাংলাদেশে কোম্পানিসমূহ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ আইন কার্যকরী হবার পূর্বাবধি এ দেশের কোম্পানিসমূহ ১৯১৩ সনের কোম্পানি আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হত। একটি কোম্পানি আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি স্বতন্ত্র ও কৃত্রিম সত্তা। এ সত্তা মালিকদের সত্তা হতে পৃথক। ফলে সদস্যদের পরিবর্তনে কোম্পানির কোনো পরিবর্তন হয় না। কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী বিলোপ সাধন না ঘটানো পর্যন্ত এর অস্তিত্ব অটুট থাকে। এ কারণেই কোম্পানিকে চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়। সুতরাং বলা যায়, কতিপয় ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত ও যৌথভাবে বিনিয়োগকৃত মূলধন দ্বারা গঠিত, আইন সৃষ্ট ও আইন সম্মতভাবে কৃত্রিম সত্তার অধিকারী চিরন্তন অস্তিত্ব সম্পন্ন ও সীমিত দায়বিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠনকে কোম্পানি বলে।

৪.২.৩.২ কোম্পানি ব্যবসায় সংগঠনের গুরুত্ব (Importance of Company)

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন আধুনিক জগতে এক অপূর্ব ও অভিনব সংগঠন। শিল্প বিপ্লব সামাজিক ও অর্থনৈতিক

অবস্থার অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে বিবর্তিত হয়েছে উৎপাদন পদ্ধতি, বেড়ে চলেছে উৎপাদনের পরিমাণ ও বাজারের আয়তন। এর সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি পুঁজি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার। একমালিকানা ও অংশীদারি ব্যবসায়-এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় গঠনে কোম্পানি ব্যবসায় সংগঠন বিশেষ অবদান রাখে। নিচে কোম্পানি ব্যবসায় সংগঠনের গুরুত্ব উল্লেখ করা হল :

১। বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান : কোম্পানি একটি বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এ ব্যবসায় পর্যাপ্ত পুঁজি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ঘটে। ফলে এ ব্যবসায় সংগঠন আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিপুল উৎপাদন ও বণ্টনের সুবিধাদি ভোগ করে।

২। সঞ্চয় বৃদ্ধি ও পুঁজি গঠন : কোম্পানি ব্যবসায় সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি ও দেশে পুঁজি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বল্প পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করেও একজন মানুষ ব্যবসায়ের অংশীদার হতে পারে। এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং দেশে পুঁজি গঠিত হয়।

৩। ঝুঁকি বণ্টন ও উদ্যোগ গ্রহণ : কোম্পানি ব্যবসায় অধিক পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সহজ। তাছাড়া এর ঝুঁকি অনেক সদস্যের মধ্যে বণ্টিত হয়। ফলে ব্যবসায়ীরা বড় ধরনের ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়।

৪। কর্মসংস্থান : কোম্পানি ব্যবসায়ের মাধ্যমে বড় ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। এক সঙ্গে বিপুল পরিমাণ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৫। বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি : কোম্পানি ব্যবসায় শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমে জনসাধারণকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করে। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত এবং কর্মজীবীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে কোম্পানি ব্যবসায় অর্থনীতিতে এক অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

৬। সরকারের আয়ের উৎস : এ ব্যবসায় সংগঠন থেকে সরকার প্রচুর পরিমাণে কর পেয়ে থাকে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়ে যায়। সরকার এ অর্থ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে সচেষ্ট হয়।

৪.২.৩.৩ কোম্পানির বৈশিষ্ট্য (Features of Company)

যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ বৈশিষ্ট্যগুলো অন্যান্য সংগঠন থেকে একে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করে। নিম্নে এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দেওয়া হল :

১। স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান : কতিপয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং যৌথভাবে মূলধন সরবরাহ করে কোম্পানি গঠন করে। কাজেই কোম্পানি কতিপয় ব্যক্তির একটি স্বেচ্ছামূলক ব্যবসায় সংগঠন।

২। আইনের সৃষ্টি : কোম্পানি আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে যৌথ মূলধনী ব্যবসায় সংগঠন গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

৩। কৃত্রিম সত্তা : কোম্পানির আইনের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি কৃত্রিম সত্তা। এ সত্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য এর নিজস্ব সিলমোহর থাকে। কোম্পানি নিজের নামে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে, অন্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারে এবং অপরেও এর বিপক্ষে এর নামেই মামলা দায়ের করতে পারে।

৪। স্থায়িত্ব : কোম্পানি চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী, সদস্যদের মৃত্যু, অবসর অথবা অস্বচ্ছলতা এর অস্তিত্বের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। আইনের নির্ধারিত বিধান পালন ছাড়া এর বিলুপ্তি ঘটানো যায় না। তাই বলা হয় কোম্পানির অস্তিত্ব চিরন্তন।

৫। সীমাবদ্ধ দায় : সদস্যদের দায় তাদের অধিকৃত নিজ নিজ শেয়ারসমূহের মোট মূল্য দ্বারা সীমাবদ্ধ। ব্যবসায়ের দেনার জন্য সদস্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কোনোভাবেই দায়বদ্ধ করা যাবে না।

৬। সদস্য সংখ্যা : যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রধানত দু'প্রকার, যথা– পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি ও প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ৭ জন এবং সর্বোচ্চ তার শেয়ারের সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন।

৭। শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতা : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকরা সহজেই ও অবাধে তাদের শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে। এ ধরনের শেয়ার হস্তান্তর কোম্পানি ব্যবসায়কে কোনোভাবে প্রভাবিত করে না।

৮। শেয়ার মূলধন : শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানি ব্যবসায়ের মূলধন সংগ্রহ করা হয়। এ মূলধন কোম্পানির শেয়ার মূলধন নামে পরিচিত।

৯। ব্যবস্থাপনা থেকে মালিকানা পৃথক : কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এর মালিকানা থেকে পৃথক। শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির প্রকৃত মালিক। আর কোম্পানি পরিচালিত হয় তাদের প্রতিনিধি পরিচালকমণ্ডলীর দ্বারা।

১০। গণতান্ত্রিক প্রশাসন : কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলা হয়। পরিচালকবৃন্দ শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে থাকে। ব্যবসায় পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের মূল্য দেয়া হয়।

৪.২.৩.৪ কোম্পানির প্রকারভেদ (Types of Companies)

নিম্নলিখিত ছকে বিভিন্ন প্রকার কোম্পানির তালিকা দেখানো হল :
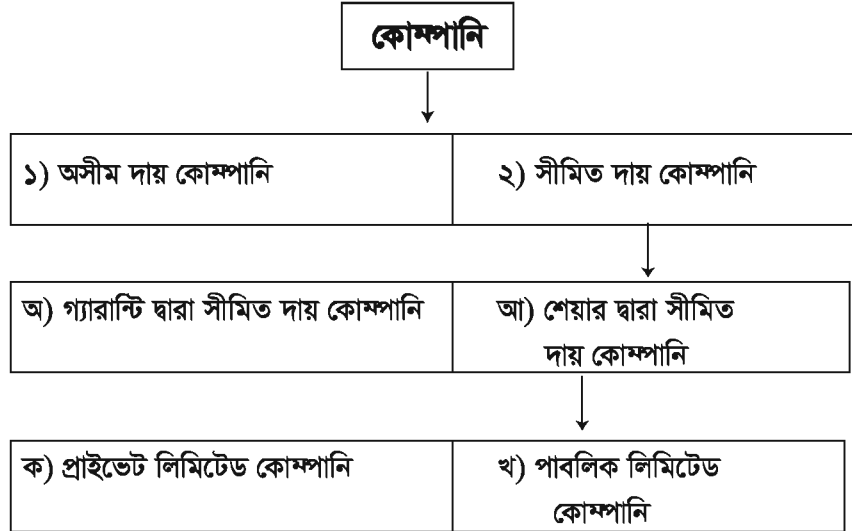
১। অসীম দায় কোম্পানি

এ ধরনের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের দায় অংশীদারদের ন্যায় অসীম। তাদের দায় তাদের সংগৃহীত শেয়ারগুলোর মোট লিখিত মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। কোম্পানির বিলুপ্তির কালে প্রয়োজনবোধে শেয়ারহোল্ডাদেরকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে কোম্পানির দায় মিটাতে হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের কোম্পানি বিরল।

২। সীমিত দায় কোম্পানি

এরূপ কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের দায় সীমিত। এ ক্ষেত্রে কোম্পানির দেনা যতই হোক না কেন এ ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারদের নির্দিষ্ট অংকের বেশি দায় বহন করতে হবে না। সীমিত দায় কোম্পানি আবার দু'প্রকার, যথা-

(অ) গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি এবং

(আ) শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি

অ. গ্যারান্টি দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি

এ ধরনের কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের তার অধিকৃত শেয়ারগুলোর মোট মূল্য ছাড়াও কোম্পানির বিলুপ্তিকালে নির্দিষ্ট অংকের টাকা পর্যন্ত দায় বহন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে থাকে।

আ. শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি

এ ধরনের কোম্পানির প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের দায় তার সংগৃহীত শেয়ার/ শেয়ারগুলোর মোট লিখিত মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ একজন শেয়ারহোল্ডার যদি কোম্পানিতে ৳১০০০.০০ টাকা মূল্যের ৫টি শেয়ার কিনে থাকে, তবে তার দায়িত্ব হবে ৳ ৫০০০.০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কখনই তাকে এর বেশি দায়িত্ব বহন করতে হবে না। শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানি আবার দু'প্রকার। যথা:- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

ক. প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি

কমপক্ষে ২ জন থেকে সর্বোচ্চ ৫০ জনের মধ্যে যে কোনো সংখ্যক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় একত্রিত হয়ে সীমাবদ্ধ দায়ের ভিত্তিতে যে কোম্পানি গঠন করে তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে।

নিবন্ধিত হবার পর পরই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে। কোম্পানি আইনে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ওপর নিম্নলিখিত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে :

১. এই কোম্পানির শেয়ারগুলো হস্তান্তরযোগ্য হবে না।

২. কোম্পানি তার শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের জন্য জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে না।

৩. কোম্পানির সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থাৎ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির সদস্য সংখ্যা হতে হবে ২ থেকে ৫০ জনের মধ্যে।

খ. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি

কমপক্ষে ৭ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে সীমাবদ্ধ দায় ও চিরন্তন অস্তিত্বসম্পন্ন যে যৌথ ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলে তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। এরূপ কোম্পানির প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের দায় তার ক্রীত শেয়ার বা শেয়ারগুলোর মোট মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এর শেয়ারগুলো অবাধে হস্তান্তরযোগ্য। কোম্পানি বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে পুঁজির ন্যূনতম অংশ সংগৃহীত হওয়ার পর এবং কোম্পানি নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতি প্রাপ্তির পর পরই কোম্পানি ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য

প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যকার মূল পার্থক্যগুলো নিচের ছকে দেখানো হল :

বিষয়	প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
১. সদস্য-সংখ্যা	সর্বনিম্ন ২ জন এবং উর্ধ্বে ৫০ জন।	সর্বনিম্ন সদস্য-সংখ্যা ৭ জন, সর্বোচ্চ সদস্য-সংখ্যা কোম্পানির শেয়ারসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
২. ব্যবসায় আরম্ভ	নিবন্ধিত হলেই এটি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে।	নিবন্ধিত হলেই এটি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে না। ব্যবসায় শুরু করার জন্য এর কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রয়োজন।
৩. প্রসপেক্টাস	এই কোম্পানি জনসাধারণের জন্য প্রসপেক্টাস প্রচার করতে এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণকে এর শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে না।	এই কোম্পানির প্রসপেক্টাস প্রচার করে জনসাধারণকে এর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারে।
৪. শেয়ার হস্তান্তর	এর শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য নয়।	এর শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য।
৫. পরিচালনা	এই কোম্পানি পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ২ জন পরিচালক থাকবে।	এই কোম্পানি ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ন্যূনতম ৩ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত একটি পরিচালক পরিষদ অবশ্যই থাকতে হবে।

৪.২.৩.৫ কোম্পানির সুবিধাসমূহ (Advantages of Company)

বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠন ও কৃত্রিম সত্তা হিসেবে যৌথ মূলধনী কোম্পানি ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানাবিধ সুবিধা ভোগ করে। নিম্নে এর সুবিধাগুলো উল্লেখ করা হল :

১. অধিক পুঁজি : কোম্পানি জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। প্রয়োজনে ঋণপত্র বিক্রির মাধ্যমেও কোম্পানির অর্থের সংস্থান করা যায়। ফলে কোম্পানির পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পুঁজির সংস্থান করা সম্ভব হয়।

২. সীমিত দায় : সদস্যদের দায় তাদের ক্রীত শেয়ারগুলোর মোট মূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত ঝুঁকি কম হওয়ায় জনগণ নিশ্চিন্তে এ ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে।

৩. চিরন্তন অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব : স্থায়িত্বের দিক থেকে কোম্পানি এক অতুলনীয় প্রতিষ্ঠান। আইনের দ্বারা সৃষ্ট কোম্পানি মালিকদের থেকে পৃথক এক কৃত্রিম সত্তার অধিকারী। কোম্পানি আইনের নির্ধারিত বিধান পালন ছাড়া এর বিলুপ্তি ঘটান যায় না। শেয়ারহোল্ডারদের মৃত্যু, দেউলিয়াত্ব বা পরিবর্তন কোম্পানির অস্তিত্বের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না। এজন্য এর স্থায়িত্ব অধিক। তাই এটি চিরন্তন অস্তিত্ব বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। স্থায়ী প্রকৃতির ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে কোম্পানির সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকটা নিশ্চিত।

৪. শেয়ার হস্তান্তর : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ারগুলো হস্তান্তরযোগ্য। শেয়ারহোল্ডার শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানি থেকে তার বিনিয়োগ উঠাতে পারে। কাজেই জনগণ কোম্পানিতে পুঁজি বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়।

৪. ঋণের সুযোগ : এরূপ ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব অধিক বিধায় এর ঋণ গ্রহণের সুযোগও বেশি। তাই কোম্পানি যে কোনো উৎস হতে সহজে ঋণ গ্রহণ করে পুঁজির অভাব মিটাতে সক্ষম হয়। ফলে এর ব্যবসায় সম্প্রসারণে কোনোরূপ অসুবিধা হয় না।

৫. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুবিধা : কোম্পানি একটি বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সকল সুযোগ সুবিধাই এরূপ প্রতিষ্ঠান ভোগ করে থাকে। ফলে এটি স্বল্প মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে দ্রুত বাজার দখল করতে পারে এবং অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ পায়। তাছাড়া বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান বলে এতে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

৬. দক্ষ ব্যবস্থাপনা : কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ভার একটি দক্ষ পরিচালক পর্ষদের ওপর ন্যস্ত থাকে। প্রয়োজনে নতুন পরিচালক নিয়ুক্তির সুবিধা থাকায় এর ব্যবস্থাপনায় নিয়তই নবতর দক্ষতার সংযোগ ঘটে।

৭. সঞ্চয়ে উৎসাহদান ও পুঁজি গঠন : স্বল্প পুঁজির মালিকরাও এরূপ ব্যবসায়ের শেয়ার ক্রয় করতে পারে এবং লভ্যাংশ পেতে পারে। ফলে মানুষের সঞ্চয়ী অভ্যাস ও বিনিয়োগ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

৮. প্রতিভা ও পুঁজির সমন্বয় : এরূপ ব্যবসায় বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির সমাবেশ ঘটে। এখানে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, প্রতিভা এবং অধিক পরিমাণ পুঁজির সমন্বয় ঘটে। ফলে ব্যবসায় সংগঠনের কৃতকার্যতা প্রায় নিশ্চিত থাকে।

৯. গণতান্ত্রিক পরিচালনা : কোম্পানি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। শেয়ার মালিকরাই প্রত্যক্ষভাবে পরিচালকমণ্ডলীকে নির্বাচিত করে। অর্থাৎ পরিচালকরা সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই, এর ব্যবস্থাপনাকে গণতান্ত্রিক বলা যায়।

৪.২.৩.৬ কোম্পানির অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Company)

কোম্পানির সুবিধার বিপরীতে কতগুলো অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে এর প্রধান অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হল :

১. জটিল গঠনপ্রণালি : কোম্পানি গঠনে অনেক আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে না। ফলে কোম্পানি গঠনে সাধারণ মানুষ উদ্যোগী হতে চায় না।

২. একচেটিয়া ব্যবসায়ের ভিত্তি : অধিক পুঁজি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য এ ব্যবসায় অল্প দিনেই বৃহদাকার ধারণ করে। ফলে এটি একচেটিয়াভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়গুলোর পক্ষে বাজারে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। এতে করে মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোকের হাতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হয়। ফলে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য বেড়ে যায়।

৩. সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিলতা : কোম্পানিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল ও সময়সাপেক্ষ। কারণ সিদ্ধান্ত নিতে নানাবিধ নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। যেমন, পরিচালনা সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিচালক পর্ষদের সভার দরকার হয়। এমনকি অতি জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের সাধারণ সভা ডাকতে হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়।

৪. সরকারি বিধি-নিষেধ : আইনের বিধি-নিষেধের আধিক্য এ ব্যবসায়ের উন্নতির পথে একটি বিরাট বাধাস্বরূপ। আইনের কঠোরতা ব্যবসায়ের স্বতঃস্ফূর্ত কার্যধারা ব্যাহত করে। আইনগত জটিলতার কারণে কোম্পানি ব্যবসায় পরিবর্তিত অবস্থায় সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না।

৫. মালিকানা হতে ব্যবস্থাপনা পৃথক : শেয়ারহোল্ডাররা ব্যবসায় পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে পরিচালকমণ্ডলী অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শেয়ারহোল্ডারদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

৬. স্বজনপ্রীতি : পরিচালকমণ্ডলীই কোম্পানি পরিচালনায় সর্বেসর্বা। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ্যতা বিচার না করে

গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে অযোগ্য আত্নীয়-স্বজনদের নিয়োগ করে থাকে। ফলে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বিঘ্নিত হয়। এর সাফল্য হয়ে পড়ে অনিশ্চিত।

৭. ব্যক্তিগত উৎসাহের অভাব : শেয়ারহোল্ডাররা ব্যবসায় পরিচালনার সঙ্গে জড়িত থাকে না। ফলে একমালিকানা বা অংশীদারি ব্যবসায়ের মত তারা ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্দীপনা কোম্পানিতে নিয়োগ করতে পারে না।

৮. গণতন্ত্রের অপব্যবহার : এ ব্যবসায়ের আইন ও তত্ত্বেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বিরাজমান। বাস্তবে সকল ক্ষমতার অধিকারী পরিচালকগণকে প্রায়শই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে দেখা যায়। কোম্পানি আইন অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের যে যতটি শেয়ারের মালিক সে ততটি ভোটাধিকার পায়। কাজেই বিত্তশালী ব্যক্তিরা অধিক সংখ্যক শেয়ার কিনে অনেক সময় কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কুক্ষিগত করে।

৪.২.৩.৭ কোম্পানি ব্যবসায়ের গঠনপ্রণালি (Formation of Company)

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে আমাদের দেশে কোম্পানি গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোম্পানি গঠনে চারটি পর্যায় রয়েছে :

১। উদ্যোগ গ্রহণ

২। দলিলপত্র প্রস্তুত

৩। নিবন্ধন ও

৪। কার্যারম্ভ

১। উদ্যোগ গ্রহণ : কোম্পানি আইনের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে কোম্পানি গঠিত হয়। প্রথম কতিপয় ব্যক্তি কোম্পানি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এদেরকে কোম্পানির উদ্যোক্তা বা প্রবর্তক বলা হয়। তারা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবসায় শুরু করার চিন্তাভাবনা করে এবং সাফল্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি গঠনে ন্যূনতম ৭ জন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন ব্যক্তিকে কোম্পানি গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়।

২। দলিলপত্র প্রস্তুত : কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রবর্তকদেরকে কতগুলো দলিল তৈরি করতে হয়। প্রথম সংঘ স্মারক বা স্মারকলিপি প্রস্তুত করতে হয়। স্মারকলিপি কোম্পানির গঠনতন্ত্র। এতে কোম্পানির নাম, ঠিকানা, ব্যবসায়ের কার্যক্ষেত্র বা উদ্দেশ্য, সদস্যদের দায় এবং অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। সংঘ-স্মারক ছাড়া কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হতে পারে না। এ ছাড়া কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি পরিচালনার নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ করে সংঘ-বিধি প্রস্তুত করতে হয়। এতে কোম্পানি পরিচালনার নিয়ম-কানুন, পরিচালকের অধিকার ও ক্ষমতা, শেয়ার বিক্রি ও বিলিকরণ, সভা আহ্বান প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে। সংঘ-স্মারক ও সংঘ-বিধি উভয়ই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ জন এবং প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন উদ্যোক্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হয়।

৩। নিবন্ধন : এ পর্যায়ে প্রবর্তকগণকে কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ফী দিয়ে নিবন্ধকের নিকট আবেদন করতে হয়। সেই সাথে নিম্নের দলিলগুলো সংযুক্ত করতে হয় :

ক। সংঘ-স্মারক বা পরিমেলবন্ধ (Memorandum of Association)

খ। সংঘ-বিধি বা পরিমেল নিয়মাবলি (Articles of Association)

গ। অনুমোদিত মূলধনের বিবৃতি

ঘ। পরিচালক হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নামের তালিকা ও তাদের লিখিত সম্মতিপত্র। পরিচালকের নামের তালিকা না দেওয়া হলেও সংঘ-স্মারকে স্বাক্ষরকারীগণ কোম্পানির প্রথম সাধারণ অধিবেশন অবধি পরিচালক হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেককে পরিচালক হিসেবে কাজ করার লিখিত সম্মতি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হবে।

ঙ। পরিচালকগণ কর্তৃক যোগ্যতাসূচক শেয়ার ক্রয়ের লিখিত প্রতিশ্রুতি

চ। কোম্পানি গঠনে কোম্পানি আইনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পালিত হয়েছে এ মর্মে একজন হাইকোর্টের এডভোকেট/ আইনজীবী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঘোষণাপত্র

কোম্পানি নিবন্ধনের আবেদনপত্র ও উপরোক্ত দলিলগুলোর মাধ্যমে প্রদত্ত তথ্যাবলি পরীক্ষা করে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে তিনি স্বহস্তে কোম্পানির অনুকূলে নিয়মিতকরণের প্রত্যয়নপত্র বা নিবন্ধনপত্র ইস্যু করবেন। এই সার্টিফিকেটকে কোম্পানির জন্ম পত্রিকা বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটি ইস্যুকৃত হলেই কোম্পানির কৃত্রিম সত্তার সৃষ্টি হয়। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে। এর আর কিছু করণীয় থাকে না। কিন্তু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এ সার্টিফিকেট পাওয়ার পর ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারে না। এটি এর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে জনসাধারণের নিকট প্রসপেক্টাস প্রচার করতে পারে এবং জনসাধারণের নিকট থেকে শেয়ার ক্রয়ের আবেদনপত্র গ্রহণ করতে পারে। ব্যবসায় আরম্ভ করার জন্য কতগুলো শর্ত পূরণ করে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে নিবন্ধকের নিকট থেকে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র (Certificate of Commencement) সংগ্রহ করতে হয়।

৪। **কার্যারম্ভ :** পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হয় :

১। কমপক্ষে আবশ্যকীয় ন্যূনতম চাঁদার অর্থের পরিমিত মূল্যের পূর্ণ আদায়ী শেয়ার বরাদ্দ এবং

২। প্রত্যেক পরিচালক কর্তৃক সংগৃহীত বা গ্রহণের জন্য চুক্তিবদ্ধ শেয়ারগুলোর মূল্য পরিশোধ এবং

৩। উপরিউক্ত (১) ও (২)-এর শর্তাবলি পালিত হয়েছে এ মর্মে রেজিস্ট্রারের নিকট কোম্পানির সচিব বা একজন পরিচালক কর্তৃক যথাযথভাবে সত্যায়নকৃত একটি ঘোষণাপত্র দাখিল এবং

৪। কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রসপেক্টাস ইস্যু না করার ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি প্রসপেক্টাসের বিকল্প বিবরণ দাখিল।

উপরিউক্ত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালিত হলে রেজিস্ট্রার উক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তার কার্যাবলি আরম্ভের অধিকারী এ মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন। এই প্রত্যয়নপত্রটিই কার্যারম্ভের ছাড়পত্র বা অনুমতিপত্র। এটি পেলেই কোম্পানি তার ব্যবসায় কার্য আরম্ভ করতে পারবে।

৪.২.৩.৮ সংঘ–স্মারক বা পরিমেলবন্ধের নমুনা (Specimen of Memorandum of Association)

শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় কোম্পানির সংঘ-স্মারক

১ম. নাম ধারা : কোম্পানির নাম চৌধুরী কটন মিল্‌স লিমিটেড হবে।

২য়. নিবন্ধন কার্যালয় ধারা : কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত হবে।

৩য়. উদ্দেশ্য ধারা : কোম্পানি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

ক) তাঁত শিল্প ও বস্ত্র বয়ন শিল্প হিসেবে ব্যবসায় চালানো এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবশ্যকীয় ভূমি ও অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় ও কারখানার অট্টালিকা নির্মাণ, খরিদ অথবা অন্য কোনোভাবে দখলীভুক্তকরণ, আবশ্যকীয় ইঞ্জিন, পাইপ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কলকজ্জা খরিদ এবং বস্ত্র বয়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় মিল খরিদ অথবা অন্য কোনোভাবে দখলীভুক্তকরণ ও সেগুলোর ব্যবহার ও হস্তান্তর।

খ) কোম্পানির উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে কোনো ভূমি, স্বত্ব (right) ও দলিলপত্রাদি ক্রয় ও দখলভুক্ত করা, ইজারা লওয়া অথবা অন্য কোনোভাবে স্বত্বাধিকার অর্জন করা।

গ) কোম্পানির ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যবসায় প্রতীক (Trade Mark) ক্রয় ও দখলভুক্ত করা অথবা অন্য কোনো উপায়ে অধিকার করা।

ঘ) কোম্পানির ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো অবস্থায় এর শেয়ার, ঋণপত্র, স্টক, বন্ড প্রভৃতি প্রচার ও বিলি করা অথবা অন্য কোনোভাবে আবশ্যকীয় মূলধনের অর্থ সংগ্রহ করা।

ঙ) কোম্পানির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য অথবা যে কোনো কারণে প্রয়োজন মনে করলে এর যে কোনো সম্পদ বিক্রয় বা হস্তান্তর করা, বন্ধক রাখা, ইজারা দেওয়া অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে হস্তান্তর করা।

চ) উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলির সমরূপ ও সেগুলো অর্জনের সহায়ক সর্বপ্রকার কার্য সম্পাদন করা।

৪র্থ. সদস্য সংখ্যা ধারা : সদস্যগণের দায়-দায়িত্ব সীমিত।

৫ম. মূলধন ধারা : কোম্পানির শেয়ার মূলধন ৳ ২,০০,০০,০০০.০০ টাকা, যার প্রতিটি শেয়ার ৳ ১০০.০০ টাকা মূল্যের ২,০০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত।

আমরা কতিপয় ব্যক্তি আমাদের নাম, ঠিকানা নিম্নে প্রদর্শনপূর্বক স্বাক্ষরদান করলাম এবং এই সংঘ-স্মারক অনুসারে একটি কোম্পানি গঠনে ইচ্ছুক হয়ে তদুদ্দেশ্যে আমরা আমাদের স্ব স্ব নামের বিপরীতে লিখিত সংখ্যক শেয়ার কোম্পানির শেয়ার মূলধন থেকে গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করলাম।

স্বাক্ষরদানকারীগণের নাম, জাতীয়তা ও পরিচয়	প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী কর্তৃক গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা (অংকে ও কথায়)	স্বাক্ষর
১. হাসান চৌধুরী ১৭, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা জাতীয়তা : বাংলাদেশী	১,০০০ (এক হাজার)	
২. মহিউদ্দিন চৌধুরী ১২০, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা জাতীয়তা : বাংলাদেশী	১,০০০ (এক হাজার)	
৩. নারায়ণ বসাক ১০৫, পিলখানা রোড, ঢাকা জাতীয়তা : বাংলাদেশী	৫০০ (পাঁচশত)	
৪। নীলিমা ইব্রাহিম ৪৪৯, মহাখালী, ঢাকা জাতীয়তা : বাংলাদেশী	২০০ (দুই শত)	
৫. বি. এম. জসিম উদ্দিন হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর জাতীয়তা : বাংলাদেশী	৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ)	
৬. বদরুন নাহার ৪৫১, নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা জাতীয়তা : বাংলাদেশী	২০০ (দুইশত)	
৭. হোসনে আরা খাতুন ৪৩, কচুখেত, মিরপুর, ঢাকা জাতীয়তা : বাংলাদেশী	২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ)	

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ উপরোক্ত স্বাক্ষরসমূহ সত্যায়নকারী সাক্ষীগণের নাম, ঠিকানা ও স্বাক্ষর

১। মোঃ আব্দুস সাত্তার
এডভোকেট, ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট
১৪২, শান্তিনগর, ঢাকা-১০০০

২। মোঃ আব্দুর রহিম চৌধুরী
১৫২, পুরানা পল্টন,
ঢাকা-১০০০
২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২৫ তারিখ

৪.২.৩.৯ কোম্পানি সংগঠনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ (Field Suitable for Company Organisation)

কোম্পানি সংগঠন একটি বৃহদায়তন যৌথ মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে এ সংগঠন ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কতিপয় ব্যক্তির যৌথ মূলধন ও সীমিত দায় নিয়ে গঠিত এ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে একই সাথে পর্যাপ্ত মূলধন ও বিভিন্নমুখী মেধা ও দক্ষ ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটে। ফলে যে সকল ক্ষেত্রে স্বল্প পুঁজির একমালিকানা ও অংশীদারি সংগঠন ব্যবসায় পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না সে সকল ক্ষেত্রে কোম্পানি সংগঠন অত্যন্ত কার্যকর বলে প্রমাণিত।

সাধারণত বৃহদায়তন ও অধিক পুঁজির প্রয়োজন হয় এমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানি সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে। যেমন– পাটকল, বস্ত্রকল, গার্মেন্টস শিল্প। ব্যাপক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পাবলিক লিমিটেড অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

৪.২.৪ সমবায় সংগঠন (Co-operative Organisation)

৪.২.৪.১ সংজ্ঞা (Definition)

সমবায়ের শাব্দিক অর্থ সম্মিলিত বা যৌথ প্রচেষ্টায় কাজ করা। এর মূলমন্ত্র হচ্ছে, "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে", "একতাই বল", "স্বাবলম্বনই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন"। সমবায়ের আরেক নাম হল সহযোগিতা। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মধ্য ও নিম্নবিত্তের মানুষের বৈষয়িক উন্নতির এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সমশ্রেণী ও পেশাভুক্ত কতিপয় ব্যক্তি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনকল্পে সমঝোতা, সহযোগিতা ও সম-অধিকারের ভিত্তিতে যে ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে তাকে সমবায় ব্যবসায় বলে। এর প্রধান উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন নয়, বরং সেই সাথে সদস্যদের বৈষয়িক কল্যাণ সাধন। সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষক, কুমার, জেলে, তাঁতি, শ্রমিক, চাকরিজীবী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজন নিজেদের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় সমবায় সংগঠন গড়ে তোলে।

যখন ভোক্তারা নিজেদের ভোগ্যপণ্য ন্যায্যমূল্যে পাবার জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে, সেই প্রকার সমবায় সমিতিকে "ভোক্তা সমবায় সমিতি" বলে।

৪.২.৪.২ সমবায় ব্যবসায় সংগঠনের গুরুত্ব (Importance of Co-operative Organisation)

সমবায় সমশ্রেণী বা পেশাভুক্ত একদল স্বল্পবিত্তের লোকের স্বাবলম্বী হওয়ার উত্তম পন্থা ও মহৎ প্রেরণা। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও ধনী গোষ্ঠীর হাতে দেশের ধন সম্পদ কুক্ষিগত হয়। এর ফলে শোষণের সূত্রপাত হয় এবং শ্রমিক-কৃষকসহ নিম্ন ও মধ্যবিত্তের লোকজন শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য এটি একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম। বাংলাদেশ একটি দারিদ্র্যপীড়িত জনবহুল দেশ। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

নিম্নে সমবায়ের কতিপয় গুরুত্ব বর্ণনা করা হল :

১। সামাজিক বন্ধন : সমবায়ের মূলমন্ত্র হল "সকলের তরে সকলে কাজ করা"। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বা সমশ্রেণীভুক্ত লোকজন ঐক্যবদ্ধভাবে পারস্পরিক আর্থিক কল্যাণের জন্য সমবায় সমিতি গড়ে তোলে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা পরস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ায়। এ অবস্থা সামাজিক বন্ধন দৃঢ়তর করে তোলে।

২। সংঘবদ্ধভাবে ভাগ্য উন্নয়নের ক্ষেত্র : সমবায় সমিতি মধ্যবিত্তের সংগঠন। এসব লোকজন এককভাবে খুবই দুর্বল ও অসহায়। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে অত্যন্ত শক্তিমান। ব্যক্তিগতভাবে যা তারা করতে পারে না সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তা সম্পাদন করতে পারে। তাই সমবায়কে আমাদের বৃহৎ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের একটি অন্যতম হাতিয়ার বললেও অত্যুক্তি হবে না।

৩। কৃষি উন্নয়ন : সমবায়ের ভিত্তিতে চাষাবাদ করে কৃষকরা উপকৃত হয়। তারা সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় যৌথ খামার গঠন করে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতে পারে। সদস্যরা সমিতি থেকে অল্প সুদে ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। তাছাড়া পানি সেচ, উন্নত বীজ ও সার সংগ্রহ, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ ও পরিবহণের বিশেষ সুবিধা পেয়ে কৃষকরা উপকৃত হয়। ফলে কৃষির উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৪। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন : সমবায়ের মাধ্যমে তাঁতী, কুমার, কামার ও হস্তশিল্পীরা নিজেদের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হয়। সমবায়ের মাধ্যমে তারা সরকারের কাছ থেকে সহজ শর্তে ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য বাজারজাত করে তারা যথেষ্ট লাভবান হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ঘটে।

৫। মধ্যস্থকারীদের শোষণ থেকে মুক্তি : সমবায়ের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও বণ্টন করে সমিতির সদস্যরা মধ্যস্থকারীদের শোষণ থেকে মুক্তি পায়। তাছাড়া, সমবায় সমিতি উৎপাদক ও পাইকারদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করে ভোক্তা সদস্য-ক্রেতাদের নিকট ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে। ফলে সমাজে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়।

৪.২.৪. ৩ সমবায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Features of Co-operative Organisation)

সমবায় সমিতি অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠন থেকে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গঠিত হয়। এর পৃথক ও স্বকীয় কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নিম্নে এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করা হল :

১। স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংগঠন : সমবায় সমিতি সমভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তির স্বেচ্ছা প্রণোদিত সংগঠন। প্রাপ্ত বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তি এ ধরনের সংগঠনের সদস্য হতে পারে।

২। সদস্য সংখ্যা : আইনানুযায়ী কমপক্ষে ১০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে সমবায় গঠন করা যাবে। সর্বাধিক সদস্য-সংখ্যা কত হবে সে সম্পর্কে আইনে কোনো কিছু উল্লেখ নেই।

৩। গঠন : সমবায় আইনানুযায়ী এরূপ সংগঠন নিবন্ধিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সমবায় সংগঠনগুলো ২০০১ সালের সমবায় সমিতি আইন এবং ২০০৪ সালের সমবায় সমিতি বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৪। পুঁজি সরবরাহ : সদস্যরা শেয়ার সংগ্রহের মাধ্যমে এর মূলধন সরবরাহ করে। সমিতির কোনো সদস্য এর শেয়ারমূলধনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক মূল্যের শেয়ার ক্রয় করতে পারবে না।

৫। পৃথক সত্তা : সমবায় সমিতি সমবায় আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি একটি কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তা। তাই এটি নিজ নামে পরিচিত হয় এবং নিজ নামে সম্পদ অধিকার ও হস্তান্তর করতে পারে। নিজ নামেই এটি অপরের বিপক্ষে মামলা দায়ের করতে পারে এবং অপরেও সমিতির নামেই সমিতির বিপক্ষে মামলা দায়ের করতে পারে।

৬। শেয়ার হস্তান্তর : সমবায় সংগঠনের শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয়।

৭। উদ্দেশ্য : মুনাফা বৃদ্ধি সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সদস্যদের পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এটি সদস্যদের সবার জন্য সর্বোত্তম সেবা ও আর্থিক সুফলের ব্যবস্থা করে।

৮। মুনাফার বিভাজন : সমবায় সংগঠনকে বার্ষিক মুনাফা থেকে ১৫% সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখতে হয়। অতঃপর উপবিধি অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টন করা যায়।

৯। দায়িত্বের প্রকৃতি : সীমিত দায় সমবায় সংগঠনের সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারমূল্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। সমবায় সমিতি আবার অসীম দায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যদের দায় অসীম।

১০। গণতন্ত্র : গণতন্ত্রের নীতির ওপর ভিত্তি করে সমবায় সংগঠন গঠিত ও পরিচালিত হয়। এর পরিচালনার ভার কয়েকজন পরিচালক নিয়ে গঠিত ম্যানেজিং কমিটির ওপর ন্যস্ত থাকে। বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে পরিচালকদের নির্বাচিত করে। কম বেশি শেয়ার অধিকার করলেও প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডার একটি মাত্র ভোটাধিকার পায়।

৪.২.৪.৪ সমবায় সংগঠনের উদ্দেশ্য (Objectives of Co-operative Organisation)

সমবায় সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য মুনাফা বৃদ্ধি নয়, বরং সদস্যদের জন্য সর্বাধিক সেবা ও আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য। নিম্নে সমবায় সমিতি গঠনের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলো আলোচনা করা হল :

১। সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করা : সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত (দুর্বল জনগোষ্ঠী) শ্রেণীকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তাদের অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দূর করা সমবায়ের প্রধান উদ্দেশ্য।

২। অর্থনৈতিক কল্যাণ : সদস্যদের জন্য সর্বাধিক আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা সমিতির অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া, সদস্যদের জন্য সেবাদান এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে।

৩। আত্মনির্ভরশীলতা : নিজস্ব উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমবায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। সমবায় সমিতি দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত লোকদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে সাহায্য করে।

৪। মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাত : সমবায় সমিতি সদস্যদের স্বল্প সুদে ঋণের সুযোগ প্রদান করে। এটি পাইকারি হারে বীজ, সার ও উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে সদস্যদের মধ্যে সরবরাহ করে এবং যৌথভাবে পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা প্রদান করে। তাছাড়া "ভোক্তা সমিতি" উৎপাদন বা পাইকারদের নিকট হতে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ করে সদস্যদের মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে। ফলে সমাজে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়।

৫। সঞ্চয় বৃদ্ধি : সমবায় সমিতি সদস্যদের স্বল্প সঞ্চয় জমা রাখার ব্যবস্থা করে, ফলে সদস্যদের মধ্যে সঞ্চয়ের আগ্রহ ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। এভাবে সদস্যদের নিজস্ব মূলধন গঠিত হয়।

৬। সম্পদের সুষম বণ্টন : ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একদল পুঁজিপতির হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়। সমবায় সমিতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে উৎপাদনের হাতিয়ার রূপে রূপান্তরিত করে। সমবায় সমিতি সমাজের জনগণের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন কিছুটা নিশ্চিত করে।

৭। উন্নত নৈতিকতাবোধ ও সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি : সমবায় সমিতি সদস্যদের মধ্যে সাম্য, সহযোগিতা, একতা, সংহতি প্রভৃতি বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এভাবে সমাজের অশিক্ষিত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান সমবায়ের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪.২.৪.৫ সমবায় সংগঠনের মৌলিক নীতিমালা (Basic Principles of Co-Operative Organisation)

সমবায় সমিতি কতিপয় আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সকল নীতির সফল প্রয়োগ সমবায়ের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিম্নে সমবায়ের নীতিগুলো আলোচনা করা হল :

১। একতা : একতাই বল। একতাই সমবায়ের সাফল্যের মূল স্তম্ভ। ঐক্যের মাধ্যমেই নিম্নবিত্ত ও স্বল্পবিত্তের লোকেরা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়।

২। সাম্য : সকল সদস্যের অধিকার ও মর্যাদা সমিতিতে সমান। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সকল সদস্যই সমমর্যাদার অধিকারী।

৩। সহযোগিতার স্পৃহা : সমবায়ের মূলমন্ত্র হল "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"। সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর সমবায়ের সাফল্য নির্ভর করে।

৪। সমবায় সমিতিতে সততা একান্ত প্রয়োজন : সদস্যদের সততা ও ন্যায়-নীতির ওপরই সমবায়ের কৃতকার্যতা নির্ভর করে।

৫। সেবার মনোভাব : সেবা সমবায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেবার মনোভাব না থাকলে জনগণ ও সদস্যদের মঙ্গল সাধন সম্ভব নয়।

৬। নৈকট্য : সমিতির সদস্যদের সমশ্রেণীভুক্ত বা একই এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। সদস্যদের কাছাকাছি অবস্থানের ওপর সমিতির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।

৭। মিতব্যয়িতা : সমিতি নিম্ন ও স্বল্পবিত্ত লোকদের প্রতিষ্ঠান। তাই অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারে সকলকে মিতব্যয়ী হতে হয়।

৮। বন্ধুত্ব : সদস্যদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব সমবায়ের ভিত মজবুত করে। পারস্পরিক সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব না থাকলে সমবায় টিকতে পারে না।

৯। গণতন্ত্র : সমবায় সংগঠন গণতন্ত্রের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি সদস্যদের কল্যাণে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। সদস্যদের যার যতই শেয়ার থাকুক না কেন, প্রত্যেকে একটি মাত্র ভোটাধিকার পায়।

৪.২.৪.৬ সমবায় সংগঠনের গঠনপ্রণালি (Formation of Co-Operative Organisation)

বর্তমানে বাংলাদেশে সমবায় সংগঠন সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এবং ২০০৪ সালের সমবায় সমিতি বিধিমালা দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। সমবায় সমিতির নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। প্রাপ্ত বয়স্ক কমপক্ষে ১০ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মিলিত হয়ে সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে। এজন্য নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধকের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়। আবেদনপত্রে উদ্যোক্তাদের নাম ও দস্তখত অবশ্যই থাকতে হয়। আবেদনপত্রের সাথে প্রস্তাবিত সমবায় সমিতির নিজস্ব উপবিধির দুই কপি নিবন্ধকের নিকট পেশ করতে হয়। উপ-বিধিতে সমবায় সমিতি পরিচালনার নিয়ম-কানুন লিপিবদ্ধ থাকে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত সমিতিকে নিম্নের শর্তগুলো পালন করতে হয় :

১। সমিতিতে প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ-মস্তিষ্কের কমপক্ষে ১০ জন সদস্য থাকতে হবে।

২। সমিতির স্বতন্ত্র নাম থাকবে এবং সীমিত দায় সমিতির ক্ষেত্রে এর নামের শেষে 'লিমিটেড' শব্দটি থাকতে হবে।

৩। আবেদনপত্রে ও উপবিধিতে সমিতির সম্ভাব্য কার্যক্ষেত্র ও ঠিকানার উল্লেখ থাকতে হবে।

৪। উপবিধিতে সমিতির উদ্দেশ্যাবলি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে।

৫। নিবন্ধকের নিকট সমিতির নিজস্ব সিলমোহরের নমুনা প্রদান করতে হবে।

নিবন্ধক আবেদনপত্র পেয়ে সকল বিষয় আইন মোতাবেক পালিত হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করে দেখবেন। সব কিছু পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি চূড়ান্ত সনদ হিসেবে তার স্বাক্ষর ও অফিসিয়াল সিল দিয়ে নিবন্ধনপত্র প্রদান করবেন। এরূপ নিবন্ধনের মাধ্যমেই সমিতির জন্ম হয় এবং এরপরই সমবায় সমিতি তার ব্যবসায় আরম্ভ করতে পারবে।

৪.২.৪.৭ সমবায় সংগঠনের সুবিধাসমূহ (Advantages of Co-Operative Organisation)

সমবায় সংগঠন বহুবিধ সুবিধা ভোগ করে। নিম্নে সমবায় সংগঠনের সুবিধাগুলো বর্ণনা করা হল :

১। নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবীদের আত্মরক্ষার উপায় : পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিক, কৃষক, তাঁতী, কুমার, কামার ও নিম্নবিত্তের লোকজন শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। সমবায়ের মাধ্যমে এ দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা একত্রিত হয়ে শোষণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

২। সঞ্চয় অভ্যাস গঠন : সমবায়ের কারণে সদস্যদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই সঞ্চয় অভ্যাস পুঁজি গঠনে সাহায্য করে। সমবায় সমিতিতে পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সাধারণ লোকেরা সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ হয়।

৩। মধ্যস্বত্বভোগীদের উৎখাত : মধ্যস্থ ব্যবসায়ীদের সাহায্য ছাড়াই সমবায় সমিতি সদস্যদেরকে পণ্য বণ্টন করে থাকে। উৎপাদক বা পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে সরাসরি পণ্য ক্রয় করে ভোক্তা-সমবায় সমিতি মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস করে।

৪। আত্মনির্ভরশীলতা : সমবায়ের সদস্যরা নিজেরাই সমিতির সব রকম কাজ করে। "স্বাবলম্বনই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন" সমবায়ের অন্যতম মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত সদস্যরা নিজেদের সমিতির কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হবার প্রয়াস পায়।

৫। সামাজিক শৃঙ্খলা ও প্রগতি : সমবায় সদস্যদের মধ্যে আত্মত্যাগ, আত্মনির্ভরশীলতা, সেবা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। এতে সামাজিক শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

৬। নৈতিকতার উন্নয়ন : সমবায়ের আদর্শগুলো এক প্রকার মানবিক দর্শন। এর নীতিমালা অনুসরণের ফলে সদস্যদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ ও সৎগুণাবলির চর্চা হয়। উন্নত জীবনের জন্য এ নীতিগুলো অপরিহার্য।

৭। ব্যয় সংকোচ : সমবায়ের সর্বস্তরের কাজগুলো সদস্যদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ফলে এর পরিচালনা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় হ্রাস পায়।

৮। সীমিত দায় : সমবায় সমিতি সীমিত দায়ের ভিত্তিতে গঠিত হতে পারে। এরূপ সমিতির দায় যতই হোক না কেন সদস্যদের দায় তাদের ক্রয়কৃত শেয়ারের মোট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৯। আর্থিক উন্নয়ন : সমবায় একটি আন্দোলন। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনসাধারণ স্বাবলম্বী হতে পারে। এ ছাড়া সমবায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। ফলে সদস্যদের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় হয় এবং জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়।

৪.২.৪.৮ সমবায় সংগঠনের অসুবিধাসমূহ (Disadvantages of Co-Operative Organisation)

সমবায় সমিতির অবিমিশ্র সুবিধাই রয়েছে তা নয়। এর কিছু কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে সমবায়ের অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হল :

১। মূলধনের অসুবিধা : সাধারণ দরিদ্র ও শ্রমজীবী লোকদের নিয়ে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তাদের পক্ষে অধিক পরিমাণ মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। মূলধনের স্বল্পতাহেতু এটা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

২। জটিল গঠনপ্রণালি : সমবায় সমিতি গঠনে নানারূপ আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। সমাজের বিত্তহীন ও অশিক্ষিত লোকদের পক্ষে এসব আনুষ্ঠানিকতা পালন করে সমবায় সমিতি গঠন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

৩। কর্তব্যে শৈথিল্য : মানুষ সকল সময়ই ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে চায়। স্বার্থ ত্যাগের নজির আমাদের সমাজে অতি বিরল। ফলে প্রথম দিকে মানুষকে কর্তব্য পালনে আগ্রহী দেখা গেলেও ক্রমশ কর্তব্যে তার শিথিলতা দেখা যায়। ফলে সমিতির অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়।

৪। দক্ষতার অভাব : সমবায় সমিতি আকর্ষণীয় বেতন দিয়ে দক্ষ লোক নিয়োগ করতে পারে না। অশিক্ষিত ও অদক্ষ সদস্যরাই ব্যবসায় পরিচালনা করে থাকে। তারা আধুনিক ব্যবস্থাপনার নিয়ম-কানুন ও কলা-কৌশল সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। এ কারণে দক্ষতার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করা তাদের পক্ষে সর্বদা সম্ভব হয় না।

৫। আত্মত্যাগ ও সহযোগিতার অভাব : সমবায়ের সাফল্যের জন্য সদস্যদের মধ্যে আত্মত্যাগ, সহযোগিতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি গুণের প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে এসব গুণের অধিকারী ব্যক্তি সমাজে বিরল।

৬। মুনাফার অনিশ্চয়তা : মুনাফা অর্জন সমবায়ের মূল উদ্দেশ্য নয়। এর মূল উদ্দেশ্য সদস্যদের কল্যাণ সাধন। ফলে এর মুনাফার সম্ভাবনা কম। এ কারণেই মানুষ এতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না।

৭। সরকারি নিয়ন্ত্রণের ঝামেলা : এরূপ ব্যবসায়ে সরকার অহেতুক অধিক আনুষ্ঠানিকতা ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। সরকারি আইন-কানুনের কারণে এর স্বাভাবিক কার্যধারা অনেক ক্ষেত্রেই বাধাগ্রস্ত হয়।

৮। শেয়ার হস্তান্তরের অসুবিধা : সদস্যরা অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করতে পারে না। শেয়ার হস্তান্তরে কড়াকড়ির জন্য অনেকেই এতে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না।

৯। টিকে থাকার অসুবিধা : সমবায় সমিতি কতগুলো আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজে এরূপ আদর্শের লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন। সমিতিতে এরূপ লোকের অভাব হলে এর ভিত হয়ে পড়ে দুর্বল। তাছাড়া সমবায় সমিতির পরিচালনায় অদক্ষতার কারণে এর পক্ষে সুদক্ষ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা দায় হয়ে পড়ে।

৪.২.৫ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন (State Business Enterprise)

৪.২.৫.১ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনের সংজ্ঞা (Definition of State Business Enterprise)

রাষ্ট্র বা সরকারের মালিকানাধীনে গঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় বলে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা সরকারি প্রচেষ্টায় নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়ে থাকে। আবার, উপস্থিত কোন বেসরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত বা জাতীয়করণ করে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সাধারণত দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সম্পদসমূহের সুষম বণ্টন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে এবং কতগুলো জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা হয়। তাছাড়া, দেশরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অস্ত্রপাতির নির্মাণ শিল্পের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখার উদ্দেশ্যেও সরকার এরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রীয় বা সরকার কর্তৃক স্থাপিত অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত এবং সরকারি প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায় সংগঠনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন বলে।

৪.২.৫.২ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনের গুরুত্ব (Importance of State Business Enterprise)

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে অত্যন্ত দ্রুত। এর সঙ্গে ব্যবসায়ের

অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যবসার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে। ফলে ধনীরা আরও ধনী হতে থাকে। দেশের অধিকাংশ সম্পদ কুক্ষিগত হতে থাকে মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে এবং সাধারণ জনগোষ্ঠী দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হতে থাকে। এ অশুভ প্রবণতাকে প্রতিহত করার জন্য ব্যক্তিমালিকানার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের পত্তন করা হয়। নিম্নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গুরুত্বের ওপর আলোচনা করা হল :

১। জনগণের কল্যাণ সাধন : জনগণের কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য, মুনাফা অর্জন নয়। এজন্য জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই কম বেশি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদের দেশে গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণ, পানি সরবরাহ, ডাক, টেলিফোন, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে।

২। একচেটিয়া ব্যবসায় বন্ধ করা : পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে জন্ম নেয় একচেটিয়া ব্যবসায়। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রভাব খর্ব করতে সাহায্য করে।

৩। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : শিল্প উন্নয়নের বড় ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য বা ইচ্ছা ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়ের থাকে না। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন ও দ্রুত শিল্প উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪। সুষম শিল্পায়ন : বেসরকারি শিল্প মালিকরা শুধু অধিক লাভজনক খাতেই পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে। অলাভজনক জনকল্যাণমূলক খাতে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায় না। তাছাড়া, তারা সুবিধাজনক অঞ্চলেই শিল্প স্থাপন করে থাকে। এমতাবস্থায়, সরকারি উদ্যোগে জনকল্যাণমূলক ও অলাভজনক খাতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে দেশের সুষম শিল্প উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৫। সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন : দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টনে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য অনেকাংশে হ্রাস পায়।

৬। অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা : চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, মূল্যের স্থিরতা বিধান, অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, জীবন রক্ষাকারী জিনিসপত্রের মান সংরক্ষণ ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

৭। মিশ্র অর্থব্যবস্থা : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতকেও শক্তিশালী করে তুলছে। প্রায় দেশেই সরকারি খাতে শিল্প উন্নয়নের অবকাঠামো সৃষ্টি করা হচ্ছে। এভাবে দেশের ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফল জনগণের নিকট পৌঁছে দিচ্ছে।

৮। জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ : জাতীয় সম্পদ জনগণের স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ওপর মূল্যবান জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেড়ে দিলে তা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। এমতাবস্থায়, দেশের বনজ, খনিজ প্রভৃতি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে রাষ্ট্রীয় সংগঠন জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করে থাকে।

৯। দেশ রক্ষা : দেশ রক্ষা সামগ্রীর উৎপাদন শিল্প সম্পূর্ণভাবে সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠে। দেশের নিরাপত্তার জন্য দেশ রক্ষার সাজ–সরঞ্জামের উৎপাদন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকা একান্ত প্রয়োজন।

১০। কর্মসংস্থান : বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। বেকার সমস্যা আমাদের দেশে অত্যন্ত ভয়াবহ। বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কম সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায়, অধিক পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে রাষ্ট্রীয় সংস্থা দেশের জনগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে।

৪.২.৫.৩ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনের বৈশিষ্ট্য (Features of State Business Enterprise)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এ সব বৈশিষ্ট্য আলোকপাত করা হল :

১। গঠন : রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন রাষ্ট্র প্রধানের অধ্যাদেশ বা জাতীয় সংসদে বিল পাশের মাধ্যমে গঠিত হয়। সরকারি অধ্যাদেশ বলে জাতীয়করণের মাধ্যমেও এরূপ ব্যবসায় গঠন করা যায়।

২। মালিকানা : রাষ্ট্রীয় সংস্থার সম্পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত থাকে। তবে সরকার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্থার আংশিক শেয়ার জনগণের নিকট বিক্রি করে থাকে।

৩। মূলধন : সরকারই সাধারণত এরূপ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে থাকে। তবে যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে সরকার ও জনগণ এর মূলধন সরবরাহ করে থাকে।

৪। আইনগত মর্যাদা : রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসায় কৃত্রিম ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত বলে এর একটি পৃথক আইনগত মর্যাদা রয়েছে।

৫। উদ্দেশ্য : মুনাফা বৃদ্ধি কোনো রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। জনসেবা ও জনকল্যাণই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠিত হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একচেটিয়া কর্তৃত্ব ভোগ করে থাকে।

৬। চিরন্তন অস্তিত্ব : রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। ফলে এ ব্যবসায় চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী। বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশ বলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অবসান ঘটানো যায়।

৭। মুনাফা বণ্টন : মুনাফা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। তা সত্ত্বেও এ ব্যবসায় কিছু মুনাফা অর্জন করে থাকে। এ মুনাফা সরকারি কোষাগারে জমা হয় এবং তা জনকল্যাণে ব্যয় হয়।

৮। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা : একটি পরিচালনা বোর্ডের ওপর রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে। বিশুদ্ধ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে সকল পরিচালকই সরকার কর্তৃক মনোনীত। আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর পরিচালকমন্ডলীর কাঠামো সংশ্লিষ্ট আইনে বর্ণিত হয়।

৯। ব্যবসায়িক বিশেষত্ব : কতিপয় বিশেষ ধরনের ব্যবসায় সরকার জনকল্যাণে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, সম্পদ সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার এবং জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্র, যেমন-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ, পানি পরিশোধন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে ব্যবসায় সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

১০। জবাবদিহিতা : এ ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য জাতীয় সংসদে সরকারকে জবাবদিহিতা করতে হয়।

৪.২.৫.৪ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনের উদ্দেশ্য (Objectives of State Business Enterprise)

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলি নিম্নে বর্ণনা করা হল :

১। জনকল্যাণ : রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নয়, বরং অধিকতর সামাজিক সেবা প্রদানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ব্যবসায় স্থাপন করে থাকে, যেমন-গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ, ডাক ও তার, পানি সরবরাহ, রেল পরিবহণ প্রভৃতি।

২। একচেটিয়া ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ : ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে দেশের অর্থ সম্পদ কুক্ষিগত হয়। এ ব্যবস্থা একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্ম দেয়, যা দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্য খর্ব করে।

৩। মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ : দেশের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৪। সম্পদের সুষম বণ্টন : দেশের সম্পদসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার ও জনগণের মধ্যে সুষমভাবে বণ্টনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়।

৫। কর্মসংস্থান সৃষ্টি : বেকার সমস্যা উন্নয়নশীল দেশগুলোর মারাত্মক ব্যধি। সুপরিকল্পিত কর্মসংস্থান ব্যবস্থার অভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপনই বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস করতে পারে।

৬। দেশ রক্ষা : দেশ রক্ষা শিল্প বিশেষ করে অস্ত্রপাতির উৎপাদন ও বণ্টন সরকারি খাতে রাখার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গঠন করা হয়।

৭। শিল্পায়নের অবকাঠামো সৃষ্টি ও ভারী শিল্প স্থাপন : দেশে শিল্পায়নের অবকাঠামো সৃষ্টি এবং ভারী ও মূলধন প্রধান শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তারা তেমন আগ্রহী হয় না। শিল্পের অবকাঠামো তৈরি ও ভারী শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে দেশের শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় সংগঠন স্থাপিত হয়।

৮। শিল্পায়নে আঞ্চলিক সমতা বিধান : বেসরকারি ব্যবসায় কতগুলো বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে স্থাপিত হয়। অপরাপর অঞ্চলগুলো শিল্পে পশ্চাৎপদ থেকে যায়। অবহেলিত অঞ্চলে শিল্প স্থাপন করে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা রাষ্ট্রীয় মালিকানার অন্যতম লক্ষ্য।

৯। সম্পদ সংরক্ষণ : দেশের খনিজ, বনজ, জলজ প্রভৃতি সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠন স্থাপন করা হয়।

৪.২.৫.৫ রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মৌলিক নীতিমালা (Basic Principles of State Business Enterprise)

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের যৌক্তিকতা রয়েছে। বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই শিল্প-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। কতগুলো মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় স্থাপন করা হয়।

১। জনস্বার্থ সংরক্ষণ : ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রায়শই একচেটিয়া ব্যবসায় দেখা যায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা কিছু সংখ্যক ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়। এর ফলে জনসাধারণ নানাভাবে শোষিত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় এ প্রবণতা বন্ধ করে। জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষা ও সমাজের কল্যাণ সাধন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্যতম মৌলিক নীতি।

২। শিল্পে অবকাঠামো সৃষ্টি : দেশে শিল্পায়নের অবকাঠামো তৈরি শিল্পায়নের জন্য অতীব প্রয়োজন। ভারী শিল্প স্থাপন ছাড়া কোন দেশের শিল্পায়ন সম্ভব নয়। তাছাড়া, এ সকল শিল্প তাৎক্ষণিক মুনাফা প্রদান করে না বিধায় ব্যক্তিমালিকানা এ কাজে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না। খনিজ ও তেলের অনুসন্ধান এবং ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্র শিল্পের অবকাঠামো সৃষ্টি করে বেসরকারি খাতকে উৎসাহ প্রদান করে থাকে।

৩। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন : দারিদ্র্য দূরীকরণ, অর্থনৈতিক অনুন্নতির অবসান, আর্থিক স্ব-নির্ভরশীলতা অর্জন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের অন্যতম লক্ষ্য।

৪। সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প-কারখানা মুনাফা অর্জনের জন্য শুধু কতগুলো বিশেষ অঞ্চলে স্থাপিত হয়। অপরাপর অঞ্চলগুলো এ ব্যাপারে অবহেলিত থাকে। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করে সকল অঞ্চলের সুষম উন্নয়নে সহায়তা করা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের একটি অন্যতম নীতি।

৫। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানায় শ্রমিকরা শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। রাষ্ট্র শ্রমিকদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া, অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসের লক্ষ্যেও রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় গড়ে তোলা হয়।

৬। সম্পদের সুষম বণ্টন : দেশের সম্পদসমূহের সুষম বণ্টন রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের একটি মৌলিক নীতি। দেশের সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয় কতিপয় হাতে পুঞ্জিভূত না হয় এ নীতির বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। এতে ক্রমশ দেশ থেকে শ্রেণী বৈষম্য দূরীভূত হতে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সীমিত দায় কোম্পানি কত প্রকার ?

ক. ২ খ. ৩
গ. ৫ ঘ. ৬

২। সমবায় সমিতি গঠনে কমপক্ষে কতজন সদস্য প্রয়োজন ?

ক. ৮ জন খ. ৯ জন
গ. ১০ জন ঘ. ১১ জন

৩। মালিকানার ভিত্তিতে ব্যবসায় সংগঠনগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ?

ক. পাঁচ খ. চার
গ. তিন ঘ. দুই

৪। পাবলিক লি: কোম্পানির প্রসপেক্টাস জনসাধারণকে অবহিত করার কারণ –

i. জনগণকে কোম্পানি সম্পর্কে অবহিত করা
ii. শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা
iii. দেশে বিনিয়োগ বাড়ানো

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে –

i. একমালিকানা সংগঠন
ii. অংশীদারি সংগঠন
iii. কোম্পানি সংগঠন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii খ. i ও iii
গ. iii ঘ. ii ও iii

৬। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের মাধ্যমে শ্রেণী বৈষম্য দূরীভূত হতে পারে –

i. সম্পদের সুষম বণ্টন করে
ii. অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে
iii. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে

৭। সমবায় সংগঠনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য –

i. অবাধে শেয়ার হস্তান্তর করা যায়
ii. বার্ষিক মুনাফার ১০% সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখতে হয়
iii. প্রাপ্ত বয়স্ক যেকোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. iii ঘ. ii ও iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ নং প্রশ্নটির উত্তর দাও]

তুষার চৌধুরি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তার মুন সিমেন্ট কোম্পানির প্রতিটি ৳ ২০০ টাকা মূল্যের ১,০০০ টি শেয়ার আছে। সম্প্রতি তিনি পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন কোম্পানিটির লোকসান হয়েছে।

৮। তুষার চৌধুরির দায়িত্ব বহনের পরিমাণ হবে–

ক. ৳ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ
খ. ৳ ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ
গ. ৳ ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
ঘ. ৳ ২,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. i ও iii ঘ. iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

যমুনা নদীর পারে রহিমের নেতৃত্বে একটি তাঁত সমবায় সমিতি গঠন করা হয়। প্রতিটি ৳ ৩,০০০ টাকা করে রহিমের ২টি শেয়ার আছে। সমিতির মোট মূলধন ৳৭৫,০০০ টাকা। সমিতির বিধি অনুযায়ী প্রত্যেকেই মূলধন অনুপাতে লভ্যাংশ পাবে। পারস্পরিক আর্থ সামাজিক কল্যাণ সাধন, সঞ্চয় বৃদ্ধিকল্পে তারা একত্রে কাজ করছে। সমিতি ২০০৭ সালে ৳ ৩০,০০০ টাকা মুনাফা করেছে।

৯। সমিতি বার্ষিক মুনাফার কী পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় তহবিলে জমা রাখবে ?

ক. ৳ ৪,৫০০ টাকা খ. ৳ ৫,০০০ টাকা
গ. ৳ ৬,০০০ টাকা ঘ. ৳ ৬,৫০০ টাকা।

১০। উল্লেখিত সমিতির মূল উদ্দেশ্য কী ?

ক. কৃষি উন্নয়ন
খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন
গ. পারস্পরিক অর্থনৈতিক সমস্যা দুর করা
ঘ. সঞ্চয়ের প্রবণতা বৃদ্ধি করা

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

নিম্নে একটি পাবলিক লি: কোম্পানির সংঘ স্মারক বা পরিমেলবন্ধের নমুনা দেয়া হল :

ক. কোম্পানির নাম– আনোয়ার কটন মিলস লি: হবে।
খ. কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়– বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মতিঝিলে হবে।
গ. প্রতিষ্ঠানটি তাঁতশিল্প ও বস্ত্র বয়ন শিল্প হিসেবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে চায়।
ঘ. কোম্পানির শেয়ার মূলধন ৳ ২০,০০,০০০০০.০০ (বিশ কোটি টাকা যার প্রতিটি শেয়ার– ৳ ১০০.০০ টাকা মূল্যের।)

১১। কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ারের সংখ্যা কত ?

ক. ২০০০০০০টি খ. ২০০০০০টি
গ. ২০০০০টি ঘ. ২০০০টি

১২। কোম্পানির ধারাগুলোর নাম কী হবে ?

ক. নাম ধারা, নিবন্ধন কার্যালয় ধারা, ব্যবসায়ের ধারা, শেয়ার ধারা
খ. নাম ধারা, নিবন্ধন কার্যালয় ধারা, উদ্দেশ্য ধারা, মূলধন ধারা
গ. কোম্পানি ধারা, কার্যালয় ধারা, লক্ষ্য ধারা, মূলধন ধারা
ঘ. কোম্পানি ধারা, কার্যালয় ধারা, উদ্দেশ্য ধারা, ডিবেঞ্চার ধারা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১০ জন ব্যক্তি ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী তাঁদের যৌথ মূলধন ও সীমিত দায় নিয়ে একটি পাটকল গঠন করেন। তারা সংগঠনটির স্মারকলিপি ও পরিমেল নিয়মাবলি তৈরি করে এই দুইটি দলিল এবং অপরাপর দলিলপত্রসহ নিবন্ধকের কাছে নিবন্ধনের জন্য পেশ করেন। নিবন্ধন শেষে কতগুলো শর্তপূরণ সাপেক্ষে তাঁরা কার্য আরম্ভের একটি অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেন।

ক. যৌথমূলধনী কোম্পানি কাকে বলে ?
খ. উল্লেখিত কোম্পানিটি কোন ধরনের যৌথমূলধনী কোম্পানি ?
গ. কোম্পানিটি কীভাবে গঠিত হয়েছে ?
ঘ. এই ব্যবসায় সংগঠনটির সাথে অংশীদারি ব্যবসায়ের কী কী অমিল রয়েছে বলে তুমি মনে কর ?

২। কুমিল্লার হোমনা অঞ্চলের কয়েকজন আলু চাষী "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে" –এ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সম-অধিকারের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নতি, নিজেদেরকে রক্ষা করা এবং নিজেদের উৎপাদিত আলু নায্যমূল্যে বিক্রয়ের জন্য একটি সমবায় বিপণন সমিতি গড়ে তোলেন।

ক. সমবায় সংগঠন কাকে বলে ?
খ. "সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"–এ নীতি বাক্য দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে ?
গ. উল্লেখিত সমবায় সংগঠন থেকে আলু চাষীরা কী কী সুবিধা পেতে পারে ?
ঘ. মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমাতে ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সমবায় সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

৩। টুটুল দশ বছর যাবত মালয়েশিয়ায় চাকরি করে দেশে ফিরে তার নিজ শহর টাঙ্গাইলের আদালত পাড়ায় স্বল্প পুঁজি নিয়ে একটি ফোন, ফ্যাক্স ও ফটোস্ট্যাট এর দোকান দেন। তিনি নিজে ফটোকপি করেন এবং ব্যবসায় পরিচালনা করেন। এখানে একটি সরকারি কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। চাহিদা থাকায় টুটুল একটি কম্পিউটার ক্রয় করেন এবং একজন কর্মচারি নিয়োগ করেন। এতে তার ব্যবসায় আরও প্রসার ঘটে।

ক. একমালিকানা ব্যবসায় কী ?
খ. একমালিকানা ব্যবসায়ের ২টি সুবিধা বর্ণনা কর।
গ. কোন কোন ক্ষেত্রে তুমি একমালিকানা ব্যবসায় গঠনের পরামর্শ দিবে ?
ঘ. টুটুলের দোকানে কম্পিউটার ক্রয় এবং কর্মচারি নিয়োগের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাজারজাতকরণ
Marketing

৫.১ বাজারজাতকরণ কী (What is Marketing)

কোন পণ্য উৎপাদন করলেই উৎপাদকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। যাদের ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন করা হয় তাদের হাতে তা পৌঁছাতে হবে। বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ক্রেতা ও ভোক্তাদের হাতে পৌঁছানো হয়।

সাধারণ অর্থে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ হল বাজারজাতকরণ। অর্থাৎ পণ্য ও সেবাকর্মের বিনিময় ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় ক্রেতা এবং বিক্রেতার যাবতীয় কার্যাবলি হল বাজারজাতকরণ। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে বাজারজাতকরণের কাজ সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাপক অর্থে উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ভোগকারীর নিকট পণ্যদ্রব্য ও সেবাকর্ম পৌঁছে দেওয়ার কার্যাবলিই হল বাজারজাতকরণ। আমেরিকার বাজারজাতকরণ সমিতির মতে, "উৎপাদকের নিকট থেকে ক্রেতা বা ব্যবহারকারীর নিকট পণ্য ও সেবাকর্ম পৌঁছে দিতে যে সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পন্ন করা হয় তাকে বাজারজাতকরণ বলে"। অর্থাৎ বাজারজাতকরণ হচ্ছে ক্রয়, বিক্রয়, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ, প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণ ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দেয়ার প্রক্রিয়া।

৫.২ বাজারজাতকরণের কার্যাবলি (Functions of Marketing)

বাজারজাতকরণ পণ্যের স্থানগত, সময়গত ও স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করে। নিচে বাজারজাতকরণের কার্যাবলি বর্ণনা করা হল :

১। ক্রয় : ক্রয় বাজারজাতকরণের অন্যতম কাজ। ভোগের জন্য বা পুনঃবিক্রয় করতে হলে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে হয়। তাছাড়া শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র প্রভৃতি সংগ্রহের নিমিত্ত ক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে। প্রতিটি বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত লেনদেনে কোনো না কোনো ব্যক্তিকে পণ্য বা সেবাদি ক্রয় করতে হয়। ফলে উৎপাদক ও ব্যবসায়ী উভয়কেই বিক্রয় কার্যে লিপ্ত হতে হয়।

২। বিক্রয় : বিক্রয় বাজারজাতকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পণ্য উৎপাদনের পরই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উৎপাদন ছাড়াও ব্যবসায়িক পণ্য ক্রয় বা আমদানির পর সেগুলো বিক্রি করা হয়।

৩। পরিবহণ : পরিবহণ পণ্যের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে। এর মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য একস্থান হতে অন্যস্থানে পৌঁছানো হয়। পরিবহণ সারাদেশে, এমন কি, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে। ফলে যে স্থানে পণ্য উৎপাদিত হয় না সেখানকার লোকজনও পণ্যদ্রব্য পেতে পারে। যেমন, পরিবহণের কারণে জাপানে তৈরি ফ্রিজ বা ঘড়ি বাংলাদেশের মানুষ ব্যবহার করতে পারছে। আমাদের তৈরি কার্পেটও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাচ্ছে এ পরিবহণের কারণেই।

৪। গুদামজাতকরণ : গুদামজাতকরণ পণ্যের সময়মত উপযোগ সৃষ্টি করে। বাজারজাতকরণের প্রায় প্রতিটি পর্যায়ে পণ্য সংরক্ষণ প্রয়োজন। যে সকল পণ্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদিত হয় অথচ সারা বছরই চাহিদা লেগে থাকে, বছরব্যাপী চাহিদা মেটানোর জন্য সে সকল পণ্য সংরক্ষণ করে তাদের সময়গত উপযোগ সৃষ্টি করা হয়। কৃষি পণ্যের

ক্ষেত্রে তাই গুদামজাতকরণ খুবই প্রয়োজন। গুদামজাতকরণ বিশেষ ঋতুতে উৎপাদিত পণ্য সারা বছর ভোগের সুযোগ করে দেয়। এ ব্যবস্থা পচন ও নষ্ট হওয়া থেকে পণ্যদ্রব্য রক্ষা করে এবং চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সমতা রক্ষা করে। বিশেষ করে কৃষি পণ্যের জন্য গুদামজাতকরণ অপরিহার্য, যেমন– শীতের সময় উৎপন্ন গোল আলু গুদামজাতকরণের ফলেই আমরা সারা বছর ভোগ করতে পারি।

৫। প্রমিতকরণ : পণ্যদ্রব্যের গুণাগুণ, রং, আকার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে পণ্যের মান নির্ধারণ করাকে প্রমিতকরণ বলে। প্রমিতকরণের ফলে বাজারজাতকরণ সহজ হয় এবং বিক্রয় কার্যে গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৬। পর্যায়িতকরণ : ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী একই জাতীয় পণ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করাকে পর্যায়িতকরণ বলে। কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে পর্যায়িতকরণ অত্যাবশ্যক, এর ফলে এর বাজারজাতকরণ সহজ হয়।

৭। মোড়কীকরণ : বিক্রয়ের সুবিধার জন্যে মোড়কীকরণ অত্যাবশ্যক। নষ্ট বা ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে পণ্য মোড়কীকরণ করা হয়ে থাকে। এ ছাড়া ব্যবহারকারীর নিকট পণ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলাও মোড়কীকরণের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিল্পজাত পণ্যের মোড়ক বাঁধাই অধিক প্রয়োজনীয়। যেমন- টেলিভিশন, কাপড়, সাবান ইত্যাদি এবং কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে পাস্তুরিত দুধ, মাংস ইত্যাদি মোড়কীকরণ করে বিক্রি করা হয়।

৮। তথ্য সংগ্রহ ঃ পণ্য ও বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ করাও বাজারজাতকরণের কাজ। বাজারে কী ঘটছে, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি কীরূপ, কোন পণ্য কোথায় কী মূল্যে পাওয়া যায় ইত্যাদি তথ্য বাজারজাতকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খুবই প্রয়োজন। প্রতিযোগিতার ধরন, রুচি ও ফ্যাশনের পরিবর্তন প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট সকলকে সরবরাহ করা বাজারজাতকরণের অন্যতম কাজ। বিভিন্ন প্রকার উৎস থেকে বাজার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যেমন– দৈনিক পত্রিকা, ব্যবসায়িক কাগজপত্র, সরকারি প্রকাশনা, বাজারজাতকরণের গবেষণা প্রভৃতি।

৫.৩ বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Marketing)

আধুনিক অর্থনীতিতে বাজারজাতকরণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যের উৎপাদনের ওপরই শুধু কোন প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে না। উৎপাদিত পণ্য বিক্রি এবং তা হতে মুনাফা অর্জনের মধ্যেই উৎপাদনের সার্থকতা নিহিত। বাজারজাতকরণের মাধ্যমে ভোক্তা বা ক্রেতাদের হাতে পণ্য পৌঁছে দেওয়া হয়। ভোগের সাথে উৎপাদনের মিলন ঘটিয়ে বাজারজাতকরণ উৎপাদনের গতিশীলতা রক্ষা করে। নিচে বাজারজাতকরণের গুরুত্ব বিশদরূপে বর্ণনা করা হল :

১। উপযোগ সৃষ্টি : বাজারজাতকরণ পণ্যের স্থানগত, সময়গত ও স্বত্বগত উপযোগ সৃষ্টি করে। উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাজারজাতকরণ সারাদেশে এবং সকল সময়ে পণ্যদ্রব্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করে।

২। বিপুল উৎপাদন : পণ্যের বাজার বিস্তৃত না হলে বিপুল উৎপাদন সম্ভব হয় না। বাজারজাতকরণ পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি ও বাজার সৃষ্টি করে। এর ফলে নিরবচ্ছিন্ন বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়।

৩। কর্মসংস্থান : বাজারজাতকরণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। বাজারজাতকরণ আছে বলেই অপ্রতিহত গতিতে উৎপাদন চলছে। ফলে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হচ্ছে। তাছাড়া বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়ায় জড়িত থেকে অসংখ্য লোক জীবিকা নির্বাহ করছে।

৪। চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য বিধান : বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বাজারে চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য বিধানে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে একদিকে ভোক্তাদের রুচি ও চাহিদার সংবাদ উৎপাদকের নিকট পৌঁছায়। অন্যদিকে ভোক্তারাও বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্যের সংবাদ পায়। ফলে ভোক্তাসাধারণের চাহিদা মত পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত

হয়। সমাজে অত্যুৎপাদন রহিত হয়। চাহিদার সাথে যোগানের সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়ার ফলে মূল্য স্তরের স্বাভাবিক স্থিরতা নিশ্চিত হয়। এতে নির্দিষ্ট আয়ের ভোগকারী জনগণ উপকৃত হয়।

৫। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : বাজারজাতকরণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। এ প্রক্রিয়ায় জনগণের রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী উন্নতমানের পণ্যদ্রব্য ও সেবা পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়। উন্নতমানের পণ্য ও সেবা ভোগের সুযোগ পেয়ে তারা জীবনমান উন্নত করতে পারে। তাছাড়া, নিত্য নতুন পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। বাজারজাতকরণের ফলে পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। এতে সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান বেড়ে যায়।

৬। ব্যবসায়ের অস্তিত্ব রক্ষা : বাজারজাতকরণ উৎপাদিত পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করে। উৎপাদিত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বাজারজাতকরণ শিল্প-বাণিজ্য তথা ব্যবসায়ের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

৭। সামাজিক কল্যাণ : সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের জন্য বাজারজাতকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদক তার উৎপাদনের চাকা সচল রাখতে সক্ষম হয়। ভোক্তা সঠিক সময়ে সঠিক জিনিসটি ভোগ করতে পারে। সমাজের সকল স্তরের লোক আপন আপন চাহিদা মিটাতে পারে।

৫.৪ কৃষিপণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ (Marketing of Agricultural and Manufactured Product)

নির্ধারিত বণ্টন প্রণালির মাধ্যমে কৃষিপণ্য ও শিল্পজাত পণ্য ভোগকারী ক্রেতাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সাধারণত পণ্য বণ্টনে নিম্নোক্ত বণ্টন প্রণালি অবলম্বন করা হয় :

১। উৎপাদক কর্তৃক সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রয়। (উৎপাদক ⟶ ভোক্তা)

২। উৎপাদক কর্তৃক খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোক্তাদের নিকট বণ্টন। (উৎপাদক ⟶ খুচরা ব্যবসায়ী ⟶ ভোক্তা)

৩। উৎপাদক কর্তৃক পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে পণ্য বণ্টন। (উৎপাদক → পাইকার → খুচরা ব্যবসায়ী → ভোক্তা)

ভৌগোলিক অবস্থার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদিত হয়। যেমন, ধান ও পাট বাংলাদেশের সর্বত্র উৎপন্ন হলেও কোনো কোনো স্থানে এগুলোর উৎপাদন বেশি। আবার, রংপুরে তামাক ভাল হয় এবং সিলেটে চা ভাল জন্মে। রাজশাহীর আম ও রেশম শুধু বাংলাদেশের অন্য এলাকায় নয় পৃথিবীর খুব কম দেশেই এমনটি জন্মায়। তাছাড়া, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাংলাদেশের অনেক স্থানে উৎপাদিত হয়। এসব দ্রব্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকার কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণের প্রায় সমরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তথাপি আমরা উভয় প্রকার পণ্যের বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করব।

৫.৪.১ বাংলাদেশে কৃষিজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত কৃষিজ পণ্যগুলোর মধ্যে ধান, পাট, চা, তামাক, ইক্ষু, পান-সুপারি, আলু, রেশম, গম, যব, ডাল, তৈলবীজ, ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি প্রধান। এসব পণ্য স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকরণে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় :

১। সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় : কিছু কিছু কৃষিজাত পণ্য সরাসরি স্থানীয় ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করা হয়। এগুলোর মধ্যে ধান, ফলমূল, আলু, বিভিন্ন প্রকার ডাল, শাক-সবজি ইত্যাদি প্রধান। এসব পণ্য স্থানীয় হাট-বাজারে এবং অদূরবর্তী নদী বন্দর বা উপশহর এলাকায় বিক্রি করা হয়। উৎপাদক বা তার প্রতিনিধিরা পণ্য নিয়ে হাটে-বাজারে বা গঞ্জে উপস্থিত হয়ে তা সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে।

২। খুচরা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে বিক্রয় : অনেক সময় উৎপাদক বা কৃষকগণ হাট, বাজার বা শহর, উপ-শহরের স্থায়ী খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট পণ্য বিক্রি করে। খুচরা ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানে পণ্য রেখে ভোগকারী ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করে। সাধারণত ধান, চাল, গোল আলু, তরিতরকারি, শাক-সবজি, আম, নারিকেল, তরমুজ, কলা প্রভৃতি এভাবে বিক্রি করা হয়।

৩। মিল মালিকদের নিকট সরবরাহ : ধান, ইক্ষু, তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপাদনকারী কৃষকরা সরাসরি স্থানীয় মিলে সরবরাহ করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরে মিল মালিকরা কৃষকদের নিকট থেকে কৃষিজাত পণ্য (যেমন, ইক্ষু) ক্রয় করে।

৪। পাইকারদের নিকট বিক্রয় : প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত পণ্য কৃষকরা পাইকারদের নিকট বিক্রি করে। স্থানীয় পাইকাররা উৎপাদনকারী কৃষকদের নিকট হতে ধান, পাট, মশুরীর ডাল, ছোলা, সরিষা, পান-সুপারি, আম, কলা ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য খুব সস্তায় ক্রয় করে থাকে।

অনেক সময় বড় রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট স্থানে স্থানীয় কৃষকরা বিক্রির জন্য তাদের পণ্য নিয়ে উপস্থিত হয়। বড় শহর বা ঢাকার পাইকাররা ট্রাক বোঝাই করে এসব পণ্য কিনে নিয়ে যায়। কাঁচা তরকারি, আম, তরমুজ প্রভৃতি এ ব্যবস্থায় বিক্রি হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে শহরের পাইকাররা আমের মুকুল আসার সঙ্গে সঙ্গে বাগানের সম্পূর্ণ আম অগ্রিম ক্রয় করে থাকে। বাগানের আম আবার বিভিন্ন সময়ে পাইকারদের মধ্যে হাত বদল হয়। আম পাকার পর পাইকাররা বড় বড় শহরে তা সরবরাহ করে লাভবান হয়।

কাঁচাপাটের বাজারে স্থানীয় পাইকার, দালাল, ফড়িয়া প্রভৃতির অস্তিত্ব বিপুল সংখ্যায় পরিলক্ষিত হয়। তারা পাট ক্রয় করে শহর, বন্দরের আড়তদারের নিকট বিক্রি করে। আড়তদাররা উক্ত পাট মিল মালিকদের সরবরাহ করে। মিল মালিকরাও অনেক সময় তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে কাঁচাপাট সংগ্রহ করে থাকে। 'বাংলাদেশ পাট রপ্তানি সংস্থা' প্রচুর পরিমাণ কাঁচাপাট সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করে। কৃষকদের জন্য ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য অনেক সময় সরকার পাটের দর নির্দিষ্ট করে দেয়।

বাংলাদেশের অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য, যেমন– ধান, পান-সুপারি, গোল আলু, তামাক প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে পাইকারদের মাধ্যমে বিক্রি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সিলেটের চা বাগানগুলোতে প্রচুর চা উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত চা–এর অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। চা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য চট্টগ্রামে চা-এর সংগঠিত নিলাম বাজার রয়েছে। এ বাজারে ডাক বা নিলামের মাধ্যমে চা বিক্রি করা হয়। তাছাড়া, চা বাগানের মালিকগণ পাইকারদের মাধ্যমে প্রচুর চা বাংলাদেশের বাজারে সরবরাহ করে থাকে।

৫। সরকারি প্রতিনিধির নিকট বিক্রয় : অনেক সময় সরকার ফসল ওঠার মওসুমে সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে কৃষিজাত পণ্য কিনে গুদামজাত করে রাখে। উদাহরণস্বরূপ সরকার বাংলাদেশের কৃষকদের নিকট থেকে নির্দিষ্ট দরে প্রচুর ধান ক্রয় করে। এভাবে সংগৃহীত ধান সরকার বছরের বিভিন্ন সময়ে ভোক্তাদের নিকট ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করে থাকে।

৬। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় : বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রধানত স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে সমিতি গঠিত হয়। সমিতি সদস্য কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য শহরে বা শিল্পাঞ্চলে ভাল দামে বিক্রি করে তাদেরকে তাদের নিজ নিজ পণ্যের মূল্য পরিশোধ করে দেয়। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্যমূল্য পেয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ সমবায় সমিতির সংখ্যা এদেশের গ্রামাঞ্চলে অতি অল্প। সাধারণত, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাপুস্ট আদর্শ গ্রামগুলোতে এ ধরনের সমবায় সমিতি দেখা যায়।

৫. ৪. ২ বাংলাদেশে শিল্পজাত পণ্যের বাজারজাতকরণ

কৃষিজাত পণ্যের ন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যও প্রায় একই পদ্ধতিতে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই ছোটখাটো শিল্প–কারখানা রয়েছে। বিসিক-এর উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প এলাকা গড়ে উঠেছে। অনেক স্থানে নানান ধরনের কুটির শিল্পও গড়ে উঠেছে। এসব ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রধান উৎপাদিত পণ্যগুলো হচ্ছে গুড়, মধু, লাল চিনি, শুকনা মাছ, লবণ, ময়দা, চকলেট, বিড়ি, সিগারেট, হোসিয়ারি বস্ত্র, তাঁত বস্ত্র, পাটের ব্যাগ, শিকা, দেয়াল মাদুর, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, মাটির জিনিসপত্র, জাল, পাটি, পাপোস, মুদ্রণ ও প্রকাশনা, করাত কলে চিরা কাঠ, কেমিক্যালস ও ঔষধপত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, ক্রীড়া সামগ্রী, পশু ও মাছের খাদ্য, কাপড় কাঁচা সাবান, চামড়ার জিনিসপত্র, পাউরুটি, বিস্কুট প্রভৃতি। নিম্নলিখিত উপায়ে এসব পণ্য বাজারজাত করা হয় :

১। সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় : কিছু কিছু উৎপাদক তাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য, যেমন- পশুখাদ্য, মাছের খাবার, গুড় ইত্যাদি সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে থাকে।

২। খুচরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিক্রয় : অনেক উৎপাদক তাদের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য নিজেরাই খুচরা দোকানদারদেরকে সরবরাহ দিয়ে থাকে। সাবান, পাউরুটি, বিস্কুট, সেমাই, তরল দুধ প্রভৃতি অধিক পরিমাণে এভাবে বিক্রি করা হয়। উৎপাদকরা স্থানীয় হাট, বাজারের খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট তাদের পণ্য সরবরাহ করে থাকে।

৩। পাইকারের মাধ্যমে বিক্রয় : বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য উৎপাদকরা স্থানীয় পাইকার বা পাইকারের ক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রি করে থাকে। সাধারণত বিস্কুট, লজেন্স, দিয়াশলাই প্রভৃতি এভাবে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি করা হয়।

৪। সমবায় সমিতি : অনেক ক্ষুদ্র শিল্প এলাকায় বা বিশেষ বিশেষ স্থানের উৎপাদকরা সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের পণ্যদ্রব্য বাজারজাত করে থাকে। সাধারণত তাঁত শিল্পীরা এ ধরনের সমবায় সমিতি গঠন করে তাদের তৈরি বস্ত্রাদি বাজারজাত করে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ছাড়া বাংলাদেশের অনেক স্থানে বৃহদায়তন শিল্প গড়ে উঠছে। এ প্রকার শিল্পগুলোর মধ্যে পাটকল, চিনির কল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব মিলে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য প্রধানত তালিকাভুক্ত বিক্রয় প্রতিনিধি বা পাইকারদের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **পরিবহণ পণ্যের কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে ?**

ক. সময়মত উপযোগ
খ. স্থানগত উপযোগ
গ. রূপগত উপযোগ
ঘ. সময় ও স্থানগত উপযোগ

২। **পণ্যের প্রমিতকরণ করা হয় –**

i. গুণাগুণের ভিত্তিতে
ii. রঙের ভিত্তিতে
iii. আকারের ভিত্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii
খ. i ও ii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

[নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

নতুন পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনকারী অথবা মিল মালিকরা বিভিন্ন পোস্টার, বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র, রেডিও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন উপায়ে পণ্য সম্পর্কে ধারণা দেন। ফলে বাজার সম্প্রসারিত হয় এবং ভোক্তারা তাদের রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী পণ্য ক্রয় করতে পারে।

৩। **ভোক্তাদের জ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করার সামগ্রিক প্রক্রিয়া হল –**

ক. বিজ্ঞপ্তি
খ. প্রচারপত্র
গ. পোস্টার
ঘ. বিজ্ঞাপন

৪। **পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ নির্ভর করে –**

ক. পণ্যের গুণের উপর
খ. পণ্যের মানের উপর
গ. পণ্যের প্রচারের উপর
ঘ. মালিকের ইচ্ছার উপর

সৃজনশীল প্রশ্ন

ঢাকা–ময়মনসিংহ রোডের ভালুকায় শিপলুর বেশ কয়েকটি কাঁঠালের বাগান আছে। তিনি উৎপাদিত কাঁঠাল স্থানীয় বাজারে পাইকারদের নিকট বিক্রয় করেন। আবার অনেক সময় নিজেই ভ্যানগাড়ী করে বাজারে কাঁঠাল নিয়ে উপস্থিত হন বিক্রয় করার জন্য। শহর বা রাজধানী ঢাকার পাইকাররা ট্রাক বোঝাই করে এ সব পণ্য কিনে নিয়ে যায়। অনেক সময় ফল পাকার আগেই পাইকাররা বাগানের সকল গাছের ফল অগ্রিম ক্রয় করে থাকে। এ বছর আশানুরূপ ফলের দাম না পাওয়ায় এলাকার কাঁঠাল বাগানের মালিকেরা একত্রিত হয়ে সমবায় সমিতির মাধ্যমে শহরে গিয়ে ফল বিক্রয়ের উদ্যোগ নিলেন।

ক. বাজারজাতকরণ কী ?
খ. শিপলুর কাঁঠাল বাজারজাতকরণে ব্যবহৃত ২টি বণ্টন প্রণালি উল্লেখ কর।
গ. এ বছর কাঁঠালের আশানুরূপ দাম না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে সমবায় সমিতির ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাইকারি ব্যবসায়
Wholeselling

৬.১ সূচনা (Introduction)

পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করা হয় ভোগের জন্য। তাই উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ভোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর প্রয়োজন পড়ে। ছোটখাট উৎপাদকরা উৎপাদন করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে। তারা পণ্য উৎপাদন করে সাধারণত নিজেরাই সরাসরি ভোক্তাদের নিকট বণ্টন করে। কিন্তু বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত হয় লক্ষ লক্ষ একক পণ্যদ্রব্য। উৎপাদকের পক্ষে সরাসরি ভোক্তাদের নিকট পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। তাই পণ্য বণ্টনে নিয়োজিত রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী। পাইকার এসব মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর একজন। পাইকার যে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে তা পাইকারি ব্যবসায় নামে পরিচিত।

নিম্নোক্ত ছকটি লক্ষ্য করলে বণ্টন প্রণালি সম্পর্কে বুঝা যাবে :

প্রত্যক্ষ বণ্টন প্রনালি
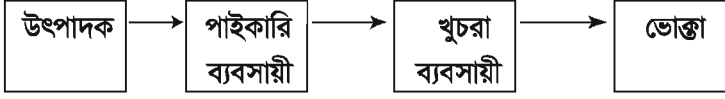
চিত্রে : পণ্য বণ্টন প্রণালি ও পাইকারি ব্যবসায়ের অবস্থান

৬.২ পাইকারি ব্যবসায় কী (What is Whoesaleship)

উল্লেখিত বণ্টন প্রণালি ছকে পাইকার বা পাইকারি ব্যবসায়ের অবস্থান দেখানো হয়েছে। বণ্টন প্রণালিতে উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যবর্তী স্থানে পাইকার বা পাইকারি ব্যবসায়ের অবস্থান। পাইকাররা উৎপাদকের কাছ থেকে অধিক পরিমাণে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে সেগুলোকে ছোট ছোট লট (Lot)–এ খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে। পাইকাররা পণ্য বণ্টনে উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।

৬.৩ পাইকারি ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Wholeselling)

১। যোগসূত্র : পাইকারি ব্যবসায়ী উৎপাদনকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। এ ব্যবসায়ের মাধ্যমে উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করা হয়।

২। বৃহৎ ক্রয়, ক্ষুদ্র বিক্রয় : পাইকার উৎপাদকের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণে পণ্য সংগ্রহ করে তা ছোট ছোট 'লটে' ভাগ করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করে।

৩। মজুতকরণ : উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করার পর নিজস্ব গুদামে অথবা ভাড়া করা গুদামে মজুত করে রাখে। বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হলে বা বৃদ্ধি পেলে তারা মাল খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করে।

৪। কেন্দ্রীকরণ : সাধারণত শহর, বন্দর ও গঞ্জে পাইকারি ব্যবসায় কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে।

৫। বৃহৎ পুঁজি : উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পাইকাররা বৃহদায়তনে পণ্য ক্রয় করে থাকে। তাই এ ব্যবসায় বৃহৎ পুঁজির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া পণ্য অনেকদিন মজুত রাখতে হয় বলেও বেশি পুঁজি লাগে।

৬.৪ পাইকারের প্রকারভেদ (Types of Wholesaler)

পণ্যের বণ্টন প্রণালিতে বিভিন্ন ধরনের পাইকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে সাধারণ পাইকার, বিশেষ পাইকার, জাতীয় পাইকার, আঞ্চলিক পাইকার প্রভৃতি প্রধান।

১। সাধারণ পাইকার : সাধারণ প্রকৃতির পাইকারি উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে মজুত করে এবং বিভিন্ন স্থানে খুচরা দোকান খুলে সেগুলো বিক্রি করে। তারা পাইকারি ও খুচরা উভয় প্রকার ব্যবসায় কার্য সম্পাদন করে। এ ধরনের পাইকাররা নিজস্ব পুঁজিতে ব্যবসায় করে এবং লেনদেনের লাভ-ক্ষতির জন্য নিজেরাই দায়ী থাকে।

২। বিশেষ পাইকার : বিশেষ প্রকৃতির পাইকাররা বিশেষ বিশেষ দু'এক প্রকার পণ্য নিয়ে ব্যবসায় করে। তারা নির্দিষ্ট উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে। বিশেষ প্রকৃতির পাইকাররা দু'ধরনের, যথা- ক) ব্যবসায়ী পাইকার এবং খ) কমিশন প্রতিনিধি পাইকার।

ব্যবসায়ী পাইকার নিজস্ব পুঁজিতে ব্যবসায় করে। লেনদেনের লাভ-ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী থাকে।

কমিশন প্রতিনিধি পাইকার নিজস্ব পুঁজিতে ব্যবসায় করে না। নির্ধারিত কমিশনের বিনিময়ে সে তার প্রিন্সিপাল (মূল) উৎপাদকের পণ্য খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করে থাকে। উৎপাদক অনেক সময় তার পণ্য বণ্টনের জন্য বিভিন্ন শহর বা বাণিজ্যকেন্দ্রে এরূপ বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে থাকে। কমিশন প্রতিনিধি পাইকার শুধুমাত্র তার প্রিন্সিপালের (Principal) পণ্য বিক্রি করে। সে তার দোকানে তার প্রিন্সিপালের পণ্য ছাড়া আর কারো পণ্য রাখতে ও বিক্রি করতে পারে না। লেনদেনের লাভ–ক্ষতির জন্য সে দায়ী হয় না। ব্যবসায়ে লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন পাইকার নির্দিষ্ট হারে তার প্রিন্সিপালের নিকট থেকে কমিশন লাভ করবে।

৩। জাতীয় পাইকার : জাতীয় পাইকাররা সমগ্র দেশজুড়ে পাইকারি ব্যবসায় করে। তারা দেশের সর্বত্র আঞ্চলিক পাইকার অথবা খুচরা ব্যবসায়ীদের মাল সরবরাহ করে থাকে।

৪। আঞ্চলিক পাইকার : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পাইকারি ব্যবসায়ে নিয়োজিত পাইকারদের আঞ্চলিক পাইকার বলে। তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে তাদের ব্যবসায় সীমাবদ্ধ রাখে।

৫। শিল্পপণ্যের পাইকার : এরা শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ কার্যে নিয়োজিত বিশেষ এক ধরনের পাইকার। তারা শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনকারীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে শিল্প মালিকদের নিকট সরবরাহ করে।

৬.৫ পাইকারের কার্যাবলি (Functions of Wholesalers)

পাইকার প্রধানত নিম্নোক্ত প্রকারের কার্য সম্পাদন করে থাকে।

১। পণ্য সংগ্রহ : পণ্য সংগ্রহ করা পাইকারের প্রথম কাজ। পাইকার উৎপাদকের নিকট থেকে পাইকারি হারে অধিক পরিমাণে পণ্য সংগ্রহ বা ক্রয় করে থাকে। পাইকারের পণ্য ক্রয়ের কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রয় দক্ষতার ওপর তার মুনাফার পরিমাণ অনেকখানি নির্ভর করে।

২। পণ্য সংরক্ষণ : পাইকার সংগৃহীত পণ্য বাজারজাত না করা পর্যন্ত নিজস্ব গুদামে অথবা ভাড়া করা গুদামে সংরক্ষণ করে। চাহিদা মোতাবেক সে পণ্য বাজারজাত করে।

৩। বাজারজাতকরণ : পাইকার সংগৃহীত পণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লটে ভাগ করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করে।

৪। পরিবহণ : পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা করা পাইকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। সংগৃহীত মাল উৎপাদকের নিকট থেকে আনয়ন এবং খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট প্রেরণের জন্য পরিবহণের দরকার হয়। পাইকার নিজস্ব যানবাহনে অথবা ভাড়া করা যানবাহনে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা করে থাকে।

৫। প্রমিতকরণ, পর্যায়িতকরণ এবং প্যাককরণ বা মোড়কীকরণ : পাইকার অনেক সময় উৎপাদকের নিকট থেকে সংগৃহীত মাল প্রমিতকরণের পর সেগুলোকে মান অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট সরবরাহ করে। তাছাড়া খুচরা ব্যবসায়ীদেরকে প্রেরণের পূর্বে মাল ভালভাবে মোড়কীকরণ করা হয়।

৬। **বিজ্ঞাপন :** পাইকার বা কমিশন প্রতিনিধিরা প্রয়োজনবোধে তাদের নিজ নিজ প্রিন্সিপাল-উৎপাদকের পণ্যের বাজারে প্রচার করে থাকে। এভাবে তারা উৎপাদকের পণ্যের চাহিদা ও বাজার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের গুঁড়ো দুধের এজেন্টরা নিজ নিজ উৎপাদকের গুঁড়ো দুধের বিজ্ঞাপন কাজ চালিয়ে থাকে।

৭। **অনুমান ও ঝুঁকি গ্রহণ :** পাইকার অনুমানের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদকের নিকট থেকে মাল ক্রয় করে মজুত রাখে। চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি পেলে সে তা বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে ব্যবসায় করে বলে তাকে ঝুঁকি বহনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

৮। **পুঁজি সরবরাহ :** পাইকারি ব্যবসায়ের সংগঠন ও পরিচালনার জন্য পাইকারকে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। অনেক সময় পাইকার পণ্য উৎপাদনকারীকে অগ্রিম প্রদান ও খুচরা ব্যবসায়ীকে ধারে মাল সরবরাহ করে থাকে। এজন্যও তার প্রচুর মূলধনের দরকার হয়।

৯। **পরামর্শদান :** পাইকার প্রায়শই উৎপাদককে পণ্যের চাহিদা পরিস্থিতি, ডিজাইন, সাইজ ইত্যাদির ব্যাপরে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এতে উৎপাদকের পক্ষে চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

৬.৬ পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার নিয়ম ও পদ্ধতি (Rules and Procedure of Forming Wholesale Business)

পাইকারি ব্যবসায় প্রধানত বৃহদায়তনের হয়ে থাকে। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে মাঝারি ও অপেক্ষাকৃত ছোট পাইকারি ব্যবসায় সংগঠনও গড়ে উঠতে দেখা যায়। একমালিকানা, অংশীদারি অথবা যৌথমূলধনী কোম্পানি সংগঠনের মাধ্যমে পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠিত হতে পারে।

পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাইকারি ব্যবসায় গঠন করার আগে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি কোথায় স্থাপিত হবে সে ব্যাপারে উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শহর, উপশহর, বন্দর, গঞ্জ প্রভৃতি জন সমাগমের স্থানে গড়ে ওঠে। বিশেষত যে সব স্থানে যাতায়াতের ও যোগাযোগের সুব্যবস্থা আছে সে সব স্থানে এ ব্যবসায় গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের খুচরা ব্যবসায়ীরা সহজেই তাদের দোকানের পণ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারে। এ কারণেই আমাদের দেশের নদী-বন্দর এলাকায় প্রচুর পাইকারি ব্যবসায় গড়ে উঠেছে। বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান বলে পাইকারি ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার জন্য প্রচুর মূলধনের দরকার হয়। উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তারা নিজস্ব তহবিল থেকে অথবা নিজ দায়িত্বে ব্যাংক বা অন্যান্য অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহ করে মূলধনের সংস্থান করতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনার পর উপযুক্ত স্থানে বাড়ি বা ঘর ভাড়া নেওয়ার ব্যবস্থা করে উদ্যোক্তাকে পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠনের পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি একমালিকানা সংগঠন হলে মালিক বা উদ্যোক্তা তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো সময় যে কোনো লাইনে ব্যবসায় শুরু করতে পারবে। তবে ব্যবসায় শুরুর আগে তাকে অবশ্যই সিটি করপোরেশন/পৌরসভা থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে। উদ্যোক্তা নির্ধারিত ফী, আবেদনপত্র ও তার সাথে বাড়ি ভাড়ার রশিদ পেশ করলে সিটি করপোরেশন/ পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করেন।

প্রস্তাবিত পাইকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি অংশীদারি সংগঠন হলে উদ্যোক্তা বা সদস্যদের মধ্যে অবশ্যই একটি অংশীদারি চুক্তি সম্পাদিত হতে হবে। অংশীদারি চুক্তি মৌখিক অথবা লিখিত উভয়ই হতে পারে। তবে, চুক্তি লিখিত হওয়াই উত্তম। এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায় শুরু করার জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।

পাইকারি ব্যবসায়ীকে যৌথমূলধনী কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উদ্যোক্তাদেরকে আমাদের দেশে বলবৎ ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী পাইকারি কোম্পানি গঠন করতে হবে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ জন এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭ জন উদ্যোক্তা কোম্পানি আইনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করে কোম্পানি গঠন করবে। আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালনের পর পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নিবন্ধনপত্র এবং কার্যারম্ভের ছাড়পত্র পেলেই ব্যবসায় শুরু করতে পারবে। কিন্তু প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নিয়মিতকরণের প্রত্যয়নপত্র বা নিবন্ধনপত্র পেলেই ব্যবসায় শুরু করতে পারবে। এ ক্ষেত্রেও কোম্পানিকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পণ্যের বণ্টন প্রণালিতে উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যবর্তী স্থানে নিম্নের কোন ব্যবসায়ের অবস্থান ?

ক. পাইকারি ব্যবসায় খ. খুচরা ব্যবসায়
গ. ক্ষুদ্র ব্যবসায় ঘ. বৃহৎ ব্যবসায়

২. উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে মজুদ করে –

i. জাতীয় পাইকার ii. সাধারণ পাইকার
iii. বিশেষ পাইকার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব জাফর একজন ফুল ব্যবসায়ী। তার ফুলের দোকানটি ঢাকার শাহবাগ এলাকায় অবস্থিত। তিনি যশোর ও ঢাকার সাভার এলাকাসহ অন্যান্য সুবিধাজনক স্থান থেকেও ফুল সংগ্রহ করে থাকেন। তিনি শহরের বিভিন্ন এলাকার ফুল ব্যবসায়ীর চাহিদা অনুযায়ী ছোট ছোট লটে ফুল সরবরাহ করে থাকেন। ফুলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবহুল ও অভিজাত এলাকা ঢাকার উত্তরায় জনাব জাফর তার ব্যবসায় সম্প্রসারণের চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ক. পাইকারি ব্যবসায় কী ?
খ. জনাব জাফরকে কোন ধরনের পাইকার বলা যায় ?
গ. জনাব জাফরের ব্যবসায়ে কী কী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে ?
ঘ. ব্যবসায় সম্প্রসারণে ঢাকার উত্তরা এলাকা বেছে নেওয়ার সপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দাও।

সপ্তম অধ্যায়

খুচরা ব্যবসায়
Retailing

৭.১ খুচরা ব্যবসায় কী (What is Retailing)

পাইকার বা উৎপাদনকারীর নিকট থেকে পণ্য সংগ্রহ করে ভোক্তাদের নিকট বিক্রয় করার সঙ্গে জড়িত কাজগুলোকে খুচরা ব্যবসায় বলে। 'গ্লস ও বেকার' এর মতে পণ্যদ্রব্য চূড়ান্ত ভোক্তাদের নিকট বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত সমুদয় কার্যাবলিকে খুচরা ব্যবসায় বলে। যিনি খুচরা ব্যবসায় পরিচালনা করেন তিনি খুচরা কারবারী নামে পরিচিত।

পণ্য বণ্টন প্রক্রিয়ায় পাইকার যেমন উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, খুচরা ব্যবসায়ী তেমনি পাইকার ও ভোক্তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। খুচরা ব্যবসায়ী যে, শুধু পাইকারদের মাধ্যমেই পণ্য সংগ্রহ করবে তা নয়, সুবিধা পেলে সে সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকেও পণ্য সংগ্রহ করতে পারে। আবার, উৎপাদকও অনেক সময় তার উৎপাদিত পণ্য নিজস্ব পরিবহণে সরাসরি খুচরা ব্যবসায়ীর দোকানে পৌঁছে দিতে পারে। আমাদের দেশের পাউরুটি, বিস্কুট, দুধ, ডিম প্রভৃতির উৎপাদনকারীদেরকে অনেক সময় তাদের পণ্য শহরের বিভিন্ন খুচরা দোকানে পৌঁছে দিতে দেখা যায়।

চিত্র : পণ্য বণ্টন প্রাণালিতে খুচরা ব্যবসায়ের অবস্থান।

সুতরাং পাইকার উৎপাদকের নিকট থেকে পণ্য সংগ্রহ করে খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রি করে এবং খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারের কাছ থেকে সংগৃহীত পণ্য খুচরা মূল্যে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে।

৭.২ খুচরা ব্যবসায়ের / ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্যাবলি (Features of Retailing)

খুচরা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে বর্ণনা করা হল :

১। স্বল্পপুঁজি ও নামমাত্র আনুষ্ঠানিকতা লাগে বলে খুচরা ব্যবসায় গঠন করা খুবই সহজ।

২। পাইকার ও ভোক্তাদের মধ্যবর্তী স্থানে খুচরা ব্যবসায়ের অবস্থান। খুচরা ব্যবসায়ী পাইকার ও ভোক্তাদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে।

৩। খুচরা ব্যবসায়ী খুচরা মূল্যে ভোক্তাদের নিকট পণ্য বিক্রি করে।

৪। খুচরা ব্যবসায়ী ভোক্তাদের চাহিদা মোতাবেক তাদেরকে পণ্য সরবরাহ করে। যখন যতটুকু জিনিস দরকার ভোক্তা তখন ততটুকু জিনিস খুচরা দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারে। যেমন, ভোক্তা যে কোনো সময় খুচরা দোকান থেকে ১ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল অথবা একটি শাড়ি বা লুঙ্গি কিনতে পারে।

৫। ভোক্তাদের সাথে খুচরা ব্যবসায়ীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে। কাজেই, ভোক্তাদের অভিরুচি ও চাহিদা সম্পর্কে সে স্পষ্ট জ্ঞান রাখে।

৬। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে ছোটখাট খুচরা ব্যবসায় স্থাপন ও পরিচালনা করা যায়।

৭। খুচরা ব্যবসায় বিশেষ দু'এক প্রকার পণ্য নিয়ে সংগঠিত হতে পারে, অথবা এটি রকমারি পণ্য সম্ভার নিয়েও ব্যবসায় করতে পারে।

৭.৩ খুচরা ব্যবসায়ের কার্যাবলি (Functions of Retailing)

খুচরা ব্যবসায়ী যে সব কাজ সম্পাদন করে তা নিচে বর্ণনা করা হল :

১। ক্রয় : খুচরা ব্যবসায়ী ভোক্তাদের পছন্দ বা চাহিদা অনুযায়ী পাইকারদের নিকট থেকে পণ্য ক্রয় করে থাকে। সুবিধা পেলে কোনো কোনো সময় সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে। কোথায় সস্তা দামে উন্নত পণ্য পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে খুচরা ব্যবসায়ীকে যথেষ্ট তৎপরতা অবলম্বন করতে হয়। ক্রয় দক্ষতার উপর খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে।

২। বিক্রয় : ভোক্তাদের নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রি করা খুচরা ব্যবসায়ের অন্যতম কাজ। বিক্রয়ে সফলতা নিশ্চিত করার জন্য খুচরা ব্যবসায়ীকে আদর্শ বিক্রয়িকতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আদর্শ বিক্রয়কর্মী পণ্যের গুণাবলি ও উপযোগিতা তুলে ধরে ভোক্তাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। খুচরা ব্যবসায়ী নিজেই অথবা বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করে বিক্রয় কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

৩। বিজ্ঞাপন : খুচরা ব্যবসায় অনেক সময় দোকানে পণ্য প্রদর্শন ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিক্রয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। এজন্য সে চেষ্টা করে পণ্যসজ্জার, আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

৪। বিভাগকরণ : খুচরা ব্যবসায়ী প্রয়োজনবোধে মাল ভাগ করে ভোক্তাদের নিকট বিক্রি করে। চীনা মাটি বা কাঁচের বাসনপত্রের ব্যবসায়ীরা সংগৃহীত মালগুলোকে এক একটি টি-সেট, ডিনার-সেট বা সরবত-সেটে ভাগ করে বিক্রি করে।

৫। মূল্য নির্ধারণ : সংগৃহীত মালের খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা খুচরা ব্যবসায়ীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সচরাচর ক্রীত মালের ওপর খরচাদি ও নির্দিষ্ট হারে মুনাফা যোগ করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণে উৎপাদক কর্তৃক নির্দেশিত মূল্য নির্ধারণ নীতি অনুসরণ করা হয়। সাবান, প্রসাধনী দ্রব্যাদি, ঔষধপত্র ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৬। পরিবহণ : খুচরা ব্যবসায়ীকে পাইকার বা সরবরাহকারীর নিকট থেকে পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্য কখনো কখনো উৎপাদক বা পাইকারও তার নিজস্ব যানবাহনে খুচরা ব্যবসায়ীর দোকানে মাল পৌঁছে দেয়।

৭। অর্থসংস্থান : খুচরা ব্যবসায়ীকে দোকান খোলা ও পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান করতে হয়। মাল ক্রয়, দোকান ভাড়া পরিশোধ, কর্মচারিদের বেতন প্রদান ও আনুষঙ্গিক খরচাদি মিটানোর জন্য তাকে পর্যাপ্ত চলতি মূলধনের ব্যবস্থা করতে হয়।

৮। ভোক্তাদের দ্বারপ্রান্তে মাল সরবরাহ : নিত্য প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক পণ্যের দোকানগুলো সচরাচর ভোক্তাদের বাসার কাছাকাছি অবস্থিত হয়ে থাকে। এর ফলে ভোক্তারা বাড়ির দ্বারপ্রান্তেই তাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহ পেয়ে থাকে। কখনো বা ফেরিওয়ালা খুচরা ব্যবসায়ীরা জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে ভোক্তাদের বাড়িতে বাড়িতে সরবরাহ দিয়ে থাকে।

৯। তথ্য সরবরাহ : খুচরা ব্যবসায়ী পাইকারদের মাধ্যমে উৎপাদকের নিকট ভোক্তাদের অভিরুচি, পছন্দ-অপছন্দ ও চাহিদা সম্পর্কে তথ্যাদি সরবরাহ করে। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদক সঠিক পণ্য উৎপাদন করতে পারে।

৭.৪ খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার নিয়ম ও পদ্ধতি (Rules and Procedures of Forming Retail Business)

খুচরা ব্যবসায় স্থাপনের জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার হয়। নিচে এসব বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হল :

১। স্থান নির্বাচন : খুচরা দোকানের স্থান নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে যেখানে সেখানে খুচরা দোকান খোলা ঠিক না। সাধারণত এক এক প্রকারের খুচরা দোকানগুলো শহরের এক এক এলাকায় বা মার্কেটের এক একদিকে অবস্থিত হয়ে থাকে। এর ফলে ক্রেতারা আশেপাশের দোকান ঘুরে ফিরে তাদের পছন্দসই জিনিস কিনতে পারে। তাছাড়া কোনো স্থানে খুচরা দোকান স্থাপন করতে হলে সে স্থানের জনসংখ্যা, ভোক্তাদের রুচি, যাতায়াতের সুবিধা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

২। বিক্রয় দক্ষতা : বিক্রয় দক্ষতার ওপর খুচরা ব্যবসায়ের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এরূপ বিক্রয়কর্মী তার অমায়িক ব্যবহার ও মোহনীয় ব্যক্তিত্বের দ্বারা ক্রেতাদের পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে নিয়মিত ও স্থায়ী ক্রেতায় পরিণত করে।

৩। ক্রয় দক্ষতা : খুচরা ব্যবসায়ীর সফলতা তার ক্রয় দক্ষতার ওপরও অনেকটা নির্ভর করে। পণ্য ক্রয়ের সময় তাকে পণ্যের মান, মূল্য, ক্রেতাদের রুচি, তাদের ক্রয় ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। তাকে উত্তম উৎস থেকে সুবিধাজনক মূল্যে উৎকৃষ্ট পণ্য ক্রয় করতে হবে।

৪। বিজ্ঞাপন : খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্যের ক্ষেত্রে পণ্য প্রচারের ভূমিকাও অনেক। গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য দোকান সুসজ্জিত রাখতে হবে। এজন্য দরকার হবে মনোরম পণ্যসজ্জা, আকর্ষণীয় সাইন বোর্ড ও অভিজ্ঞ বিক্রয়কর্মী।

৫। পর্যাপ্ত মূলধন ও কাম্য আয়তন : খুচরা ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসায় পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে। পর্যাপ্ত মূলধন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাম্য আয়তন নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। কাম্য আয়তনের প্রতিষ্ঠান সফলতা অর্জনে সক্ষম।

৬। সুনাম : সুনাম প্রতিটি ব্যবসায়ের মূল্যবান ভূষণ। সুনাম প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ক্রেতারা সর্বদা দোকানে ভিড় জমাবে। উৎকৃষ্ট ও রকমারি পণ্য মজুত, অমায়িক ব্যবহার, ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ফেরত-গ্রহণ প্রভৃতি খুচরা ব্যবসায়ের সুনাম প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

৭.৫ খুচরা বিপণি প্রতিষ্ঠার নিয়ম ও পদ্ধতি (Rules and Procedure of Establishing Retail Store)

খুচরা বিপণি গড়ে তোলার জন্য এর উদ্যোক্তাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত : স্থান নির্বাচন খুচরা বিপণি প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কোনো স্থানে খুচরা দোকান স্থাপন করতে হলে উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের রুচি ও চাহিদা, তাদের ক্রয় ক্ষমতা, সংশ্লিষ্ট এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা, সমজাতীয় অন্যান্য দোকানের সান্নিধ্য প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : খুচরা ব্যবসায়ের সমৃদ্ধির জন্য আকর্ষণীয় সাইন বোর্ড, মনোরম পণ্যসজ্জা এবং আদর্শ বিক্রয়কর্মী অত্যাবশ্যক। বিশেষত খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে ব্যক্তিগত বিক্রয়িকতার ওপর নির্ভর করে। কাজেই খুচরা ব্যবসায়ীকে তার দোকানের জন্য অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও মিশুক স্বভাবের বিক্রয়কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত : উদ্যোক্তা বা খুচরা ব্যবসায়ীকে প্রস্তাবিত ব্যবসায়ের জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। নিজস্ব তহবিল থেকে সম্পূর্ণ মূলধন সংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে তাকে ব্যাংক বা অন্যান্য অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করতে হবে এবং এজন্য তাকে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হবে।

চতুর্থত : প্রস্তাবিত খুচরা বিপণির আয়তন কীরূপ হবে তাও উদ্যোক্তাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। তার দোকানের আয়তন ক্ষুদ্র, বৃহৎ না মাঝারি হবে তা তাকেই নির্ধারণ করতে হবে। প্রস্তাবিত দোকানটি অবশ্যই কাম্য আয়তনের হতে হবে। এরূপ আয়তনবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক সাফল্য নিশ্চিত করে। ব্যবসায়ের প্রকৃতি, পণ্যের মূল্য ও প্রকৃত চাহিদার পরিমাণ, ক্রেতাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে বিপণির আয়তন নির্ধারণ করতে হবে।

কিছু কিছু খুচরা বিপণি বৃহদায়তনের হয়ে থাকে, যেমন- বিভাগীয় বিপণি, বহুশাখা বিপণি প্রভৃতি। এ ধরনের বিপণি কোম্পানি সংগঠনের মাধ্যমে গঠন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বলবৎ কোম্পানি আইন, ১৯৯৪-এর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অথবা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে বৃহদায়তনের খুচরা বিপণি গঠন করা যায়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি আয়তনের খুচরা বিপণি একমালিকানা বা অংশীদারি সংগঠনের মাধ্যমে গঠন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশের অধিকাংশ খুচরা বিপণি একমালিকানা সংগঠন ও অংশীদারি ফার্ম হিসেবে সংগঠিত। একজন ব্যক্তি নিজস্ব পুঁজিতে অথবা নিজ দায়িত্বে অন্যের নিকট থেকে ঋণ সংগ্রহ করে যে কোনো খুচরা ব্যবসায় গড়ে তুলতে পারে। আমাদের দেশের শহর, বন্দর, গঞ্জ এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের হাট, বাজার ও পাড়াতে একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন হিসেবে অসংখ্য খুচরা দোকান গড়ে উঠেছে। খুচরা দোকান প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করে উপযুক্ত স্থানে দোকান ঘর ভাড়া নিতে হয়। এরপর তাকে দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নির্মাণ এবং ছোটখাটো যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হয়। খুচরা ব্যবসায় চালু করার পূর্বে উদ্যোক্তাকে অবশ্যই পৌরসভা/সিটি করপোরেশন থেকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য তাকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত মাসুলসহ আবেদনপত্র পেশ করতে হয় এবং সেই সঙ্গে দোকান ভাড়ার দলিলের কপি ও হাল নাগাদ ভাড়ার রশিদ দাখিল করতে হয়। অতঃপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সাধারণ সিলমোহর দিয়ে লাইসেন্স প্রদান করবেন।

সব কিছু প্রস্তুত হয়ে গেলে খুচরা ব্যবসায়ী সুবিধাজনক উৎস থেকে (পাইকার বা সরাসরি উৎপাদকের নিকট থেকে) পণ্য সংগ্রহ করে ব্যবসায় শুরু করবে। খুচরা ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকাংশে খুচরা ব্যবসায়ীর ক্রয় দক্ষতা ও সততার ওপর নির্ভর করে। তাকে পণ্যের মান, মূল্য, সম্ভাব্য ক্রেতাদের রুচি ও চাহিদা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে পণ্য সংগ্রহ করতে হবে। বাজারে সুনাম প্রতিষ্ঠা ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য তাকে আদর্শ বিক্রয়কর্মী নিয়োগ করতে হবে। ভোক্তাদের সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম হলে সে ব্যবসায়ের সর্বাধিক সফলতা অর্জন করতে পারবে।

একমালিকানা সংগঠন ছাড়াও অংশীদারি ফার্মের মাধ্যমে খুচরা বিপণি সংগঠিত হতে পারে। এরূপে সংগঠিত খুচরা বিপণির উদ্যোক্তাদেরকেও ব্যবসায় আরম্ভ করবার আগে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়।

সমবায় সমিতির মাধ্যমেও খুচরা ব্যবসায় গঠন করা যায়। বিশেষ করে ভোক্তা-সমবায় সমিতিগুলো আদর্শ খুচরা বিপণি প্রতিষ্ঠা করে। কোনো এলাকার বাসিন্দারা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা বা নিম্ন ও নির্দিষ্ট আয়ের লোকেরা একত্রিত হয়ে তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য অল্প স্বল্প পুঁজি সরবরাহ করে ভোক্তা-সমবায় সমিতি গঠন করতে পারে। আমাদের দেশের সমবায় সমিতিগুলো ২০০১ সালের সমবায় আইনের বিধান অনুযায়ী সংগঠিত হয়। কাজেই, এ আইনের ধারা মতে সমিতি গঠন করতে হবে। সমিতি সরাসরি উৎপাদকের কাছ থেকে বা পাইকারদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে ন্যায্যমূল্যে ভোক্তা-সদস্যদের নিকট বিক্রি করে। এ ক্ষেত্রেও ব্যবসায় আরম্ভ করবার পূর্বে সমিতিকে ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। ব্যবসায় বছর সমাপনান্তে সদস্যরা নিজ নিজ মোট বার্ষিক ক্রয়ের ওপর ভিত্তি করে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। ভোক্তা সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত খুচরা বিপণির ক্ষেত্রে ভোক্তা সদস্যরা দুইভাবে উপকৃত হয়। প্রথমত, তারা ন্যায্যমূল্যে, অর্থাৎ অনেক সস্তায় তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, তারা ব্যবসায় বছর সমাপনান্তে লভ্যাংশ হিসেবে বিপণির মুনাফার অংশ পেয়ে থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. খুচরা ব্যবসায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল –

ক. ক্রয় খ. বিক্রয়
গ. মূল্য নির্ধারণ ঘ. বিজ্ঞাপন

২. খুচরা ব্যবসায়ের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় –

i. শহর, বন্দর, গঞ্জে ii. গ্রাম্য হাট, বাজারে
iii. পাড়ায় ও মহল্লায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. i, ii ও iii ঘ. ii ও iii

(নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও)

মুকুল তার পিতার ঔষধের দোকানে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে কক্সবাজার পৌরসভা থেকে অনুমতি নিয়ে সমুদ্র সৈকত মোড়ে একটি মনিহারি দোকান দেয়। তার সততা, অভিজ্ঞতা, ক্রয় দক্ষতা, পণ্যের মান, মূল্য ও ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করায় অল্প সময়ের মধ্যে তার ব্যবসায় সাফল্য এসেছে।

৩। কক্সবাজার পৌরসভা থেকে মুকুলের সংগৃহীত অনুমতিপত্রের নাম কী ?

ক. ট্রেড লাইসেন্স খ. নিবন্ধনপত্র
গ. অনুমতিপত্র ঘ. লাইসেন্স

৪। মুকুলের ব্যবসায়ে সাফল্যের কারণ –

ক. স্থান নির্বাচন খ. ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধান
গ. ক্রয় দক্ষতা ঘ. বিক্রয় দক্ষতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের সামনে জনাব রফিকের একটি ঔষধের দোকান আছে। তার দোকানে দুইজন বিক্রয়কর্মী আছে। তিনি ঢাকার মিটফোর্ট এবং স্থানীয় পাইকারি ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ঔষধ ক্রয় করে বিক্রি করে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধির মাধ্যমেও ঔষধ ক্রয় করেন। শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় তার ব্যবসায় বেশ ভাল চলছে।

ক. খুচরা ব্যবসায় কী ?
খ. খুচরা ব্যবসায়ের উল্লেখযোগ্য ২টি কাজ বর্ণনা কর।
গ. পণ্যের বণ্টন প্রণালিতে জনাব রফিকের অবস্থান চিহ্নিত কর।
ঘ. রফিক সাহেবের ব্যবসায়ের স্থান নির্বাচনের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন কর।

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প
(Small and Cottage Industry)

৮.১ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা (Definition of Small and Cottage Industry)

বাংলাদেশের শিল্পনীতি ২০০৫-এ ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এই সজ্ঞা অনুসারে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় অনধিক ১.৫০ কোটি টাকা। আবার নন-ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে, যেখানে ২৫ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে (কুটির শিল্পের মত পরিবারের লোকজন নয়)। "কুটির শিল্প" বলতে এরুপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যা পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পুর্ণ অথবা খন্ডকালীন সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামুলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত। সাধারণত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সহায়তায় কুটির শিল্প পরিচালিত হয়। তবে কখনও কখনও পরিবার বহির্ভূত দক্ষ শ্রমিক এতে নিয়োজিত হতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পে কারখানা ছোট হয়। তবে এতে বিদ্যুৎ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্যরা এর মূল কর্মী নয়। অধিকাংশ কাজই পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নিয়োজিত শ্রমিক দ্বারা সম্পাদিত হয়। দেশভেদে অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞায় পার্থক্য দেখা যায়। ক্ষুদ্র শিল্প উৎপাদনকারী ও সেবা প্রদানকারী উভয় ধরনের হতে পারে।

৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব (Importance of Small and Cottage Industry in the Economy of Bangladesh)

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প অধিকতর উপযোগী। নিচে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

১। মূলধন সাশ্রয় ও অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি : উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আমাদের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। কারণ কুটির শিল্প তুলনামূলকভাবে শ্রম প্রধান।

২। সহায়ক পেশা : বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ খন্ডকালীন বেকারত্বের স্বীকার বিশেষ করে কৃষিকাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী বছরের কিছু সময় বেকার থাকে। এসব খন্ডকালীন বেকারত্ব দূর করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকায় কৃষি ও কৃষি বহির্ভূত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

৩। মহিলাদের কর্মসংস্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিশেষ করে কুটির শিল্প পারিবারিক পরিবেশে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। মহিলাদের বেকারত্ব আমাদের দেশে ভয়াবহ। পরিবারের মহিলা সদস্যরা তাদের কাজের অবসরে কুটির শিল্পে কাজ করে আয় বাড়াতে সক্ষম হয়। এতে পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্রতা দূর হয়।

৪। স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রধানত স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ও উপকরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে দেশের মধ্যে প্রাপ্ত কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়। কুটির শিল্প পল্লী অঞ্চলের সম্পদ বৃদ্ধির বাহন। ফলে স্বল্প পুঁজি, দেশজ কাঁচামাল ও নৈপুণ্যের বিনিয়োগে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৫। আত্মকর্মসংস্থান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে প্রয়োজন স্বল্প পুঁজি ও কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ। এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের বিপুল সংখ্যক বেকার ও অর্ধ বেকার লোকদের জন্য আত্মকর্মসংস্থান ও আয় বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৬। উদ্যোক্তার প্রতিভা লালন : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের উদ্যোক্তাদের শিল্পোদ্যোগের ফল। ক্ষুদ্র শিল্পে সফলতা অর্জন করলে সে নতুন ও বড় ধরনের কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

৭। আয় বণ্টন : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সারাদেশ ব্যাপী ছড়িয়ে থাকলেও বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করে, ফলে আয়ের এক ধরনের বিস্তৃত বণ্টন হয়ে থাকে।

৮। সুষম উন্নয়ন : বৃহদায়তন শিল্প প্রধানত শহরাঞ্চলে এবং বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে গড়ে ওঠে। এর ফলে মুষ্টিমেয় শহরাঞ্চল ও শিল্প এলাকার উন্নতি হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের সর্বত্রই স্থাপন করা যায়। ফলে দেশের সুষম উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৯। শিল্পের কাঠামো শক্তিশালীকরণ : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের শিল্পায়নের মুখ্য উপায়। স্বল্প পুঁজি দক্ষতা নিয়ে এই শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব বলে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় একমাত্র এই শিল্পের মাধ্যমেই দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব। তাছাড়া বৃহদায়ন শিল্পে কাঁচামাল ও দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করেও ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দেশের শিল্প কাঠামো শক্তিশালীকরণে সাহায্য করে।

১০। জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলার সংরক্ষণ : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এ শিল্পের নানা পণ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এক সময় আমাদের কুটির শিল্পের জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল। জাতীয় ঐতিহ্য ও শিল্পকলা সংরক্ষণে কুটির শিল্প গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৮.৩ কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকারভেদ (Kinds of Small and Cottage Industry)

নিচে বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের বর্ণনা দেওয়া হল :

ক. কুটির শিল্পের প্রকারভেদ

পরিবারের সদস্য দ্বারা পূর্ণ বা খন্ডকালীন সময়ে পণ্য উৎপাদন কর্মকান্ডে নিয়োজিত শিল্পকে কুটির শিল্প বলে। কুটির শিল্প বহু রকমের হতে পারে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকারভেদ উল্লেখ করা হল :

১। পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প : যেমন-স্কুল ব্যাগ, শিকা, দেয়াল মাদুর, পাটের স্যান্ডেল, কার্পেট ইত্যাদি তৈরি।

২। বাঁশ ও বেতের শিল্প : বেতের ঝুড়ি, বাল্ব শেড, চায়ের ট্রে, বেতের চেয়ার, দোলনা, পুতুল, গ্লাস, ঝুড়ি ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি।

৩। তাঁত শিল্প : শাড়ি, লুঙ্গি, টেবিল ক্লথ, কোর্তা, শোফার ক্লথ, জামদানি ইত্যাদি তৈরি করা।

৪। মৃৎ শিল্প : বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তু, পুতুল, ফুলদানি, ফুলের টব, হাঁড়ি, কলসি ইত্যাদি নির্মাণ।

৫। হস্ত শিল্প : হাতের তৈরি কার্পেট, সতরঞ্চি, নকশিকাঁথা ইত্যাদি তৈরি।

৬। ক্ষুদ্র ইস্পাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত : দা, কোদাল, খোন্তা, কাঁচি, সুরমাদানি, তৈলাধার ইত্যাদি প্রস্তুত।

৭। ঝিনুক শিল্প : ঝিনুকের মালা, অলংকার, খেলনা ইত্যাদি তৈরি।

বিবিধ শিল্প : এ ছাড়া মাছ ধরার জাল, পাটি, মাদুর ইত্যাদি বুনন, সোনা, রুপা, দস্তা, কাঁচ, শঙ্খ ইত্যাদির অলংকারাদি নির্মাণ, নারিকেল ছোবড়ার রশি, পাপস ইত্যাদি তৈরি, চামড়ার ব্যাগ, জুতা, স্যান্ডেল, বেল্ট ইত্যাদি তৈরি, তামা, কাঁসা পিতল ইত্যাদি বাসনপত্র তৈরি প্রভৃতি অন্যান্য কুটির শিল্পের অন্তর্গত।

খ. ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকারভেদ

ক্ষুদ্র শিল্পের বিনিয়োগ ৳১০ কোটি টাকার মধ্যে সীমিত থাকতে হবে এবং নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ৫০ জনের কম হতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকারভেদ পরের পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হল :

১। খাদ্য ও খাদ্যজাত দ্রব্যাদির শিল্প : লাল চিনি, মধু শোধন, শুকনা ও টিনজাত মাছ, ভেজিটেবল ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, লবণ প্রক্রিয়াকরণ, তেলের মিল, ময়দার মিল, চকলেট কারখানা, সিগারেট ও চুরুট কারখানা ইত্যাদি।

২। বস্ত্র শিল্প : হ্যান্ডলুম, হোসিয়ারি, অস্ত্রপচারে ব্যবহৃত বস্ত্র সামগ্রী ইত্যাদি।

৩। পাট ও পাটজাত শিল্প : জুট টোয়াইন, কাপড়, কার্পেট ও সকল পাটজাত দ্রব্যাদি তৈরির শিল্প।

৪। বন শিল্প : বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র নির্মাণ, করাত কল, কাঠের খেলনা ও আসবাবপত্র তৈরি ইত্যাদি শিল্প।

৫। মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প, প্যাকেজিং ইত্যাদি।

৬। গ্লাস ও সিরামিক সামগ্রী তৈরির শিল্প।

৭। রাবার ও চামড়া শিল্প।

৮। কেমিক্যালস ঔষধপত্র প্রস্তুত শিল্প।

৯। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ইত্যাদি।

১০। বিবিধ ক্ষুদ্র শিল্প : ক্রীড়া সামগ্রী, পশু খাদ্য, ছাতা, প্যাকিং বোর্ড, রেড অক্সাইড, পালিশের সামগ্রী, কাপড় ধোয়া সাবান, টি.ভি. এন্টেনা, তালা, চীনা মাটির জিনিসপত্র, জ্যাম, জেলি, বোতাম ইত্যাদি প্রস্তুত শিল্প এবং পোলট্রি ফার্ম, ডেইরি ফার্ম, বেকারি, রাইস মিল প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

৮.৪ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় (Factors to be Considered for Establishing Small and Cottage Industries)

কুটির শিল্প প্রধানত পরিবারভিত্তিক। শিল্পের উদ্যোক্তা নিজেই কারিগর। তাই কুটির শিল্প বিকাশে পারিবারিক পরিবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনা করে কুটির শিল্প গড়ে তুলতে হবে, পরিবার ও কারুপাড়া ভিত্তিতে। ক্ষুদ্র শিল্প পরিবার বহির্ভূত শ্রম নির্ভর। তাছাড়া কারখানার আয়তন ও পণ্যের প্রকৃতি ভিন্ন। উভয়ের আয়তন, পণ্যের প্রকৃতি শ্রমিকের নৈপুণ্য প্রভৃতিতে যদিও পার্থক্য বিদ্যমান কিন্তু এই সব শিল্প কারখানা স্থাপন মোটামুটি একইরূপ। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প স্থাপনের সময় যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন তা নিচে উল্লেখ করা হল :

১। কাঁচামালের সহজলভ্যতা : কাঁচামাল সহজলভ্য এমন স্থানে কারখানা স্থাপন করা হলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। এ কারণে সিলেট ও কুমিল্লাতে বেত ও বাঁশের বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প স্থাপিত হতে দেখা যায়।

২। বাজারের নৈকট্য : উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রির জন্য প্রয়োজন বাজারের। অপরদিকে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য বাজার কাছাকাছি থাকা বাঞ্চনীয়। কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি দ্রুত বিক্রির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে বাজারের নৈকট্য আবশ্যক।

৩। পরিবহণের সুযোগ : পণ্যের চাহিদা স্থানীয় হলে বিপণন ব্যবস্থাও স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু পণ্যের বাজার বিস্তৃত হলে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি সুষ্ঠভাবে আনা নেয়ার জন্য যোগাযেগের সুব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক।

৪। শ্রমিকের পর্যাপ্ত যোগান : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে দক্ষ জনশক্তি ও স্বল্প মজুরিতে শ্রমিকের প্রাপ্যতা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমাদের দেশে কুটির শিল্পের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা আবার বাড়ছে। কিন্তু ডিজাইন ও নিপুণ কারিগরি জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই দক্ষ শ্রমিকের যোগান অপরিহার্য। এজন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

৫। স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদা : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সাধারণত স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই শিল্প স্থাপন করতে স্থানীয় চাহিদা ও বাজারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আজকাল বৈদেশিক বাজারেও এই শিল্পজাত পণ্যের ব্যাপক চাহিদা আছে। তাই এ দিকটাও বিবেচনা করা দরকার।

৬। পুঁজি যোগান : শিল্প স্থাপন ও উৎপাদন কাজ অব্যাহত রাখার জন্য মূলধন আবশ্যক। সাধারণত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন। কিন্তু এই স্বল্প পুঁজিও অনেক উদ্যোক্তার পক্ষে নিজস্ব সম্পদ থেকে যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। তাই প্রয়োজন ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সুযোগ সুবিধার।

৭। বাজার তথ্যের প্রাপ্যতা : পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বাজার তথ্য অপরিহার্য। বাজারে কোন পণ্যের চাহিদা রয়েছে, কোথায় এবং কীভাবে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ করা হবে এবং সরকারি নীতিমালা সংক্রান্ত তথ্যাবলি জানা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অত্যন্ত জরুরি। তাই সঠিক বাজার তথ্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

৮। সরকারি সুযোগের সহজলভ্যতা : অধুনা সরকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। সরকার "বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার" মাধ্যমে শিল্প স্থাপনে কতগুলো সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। সরকারি সহযোগিতা আরও বাড়াতে হবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়টি শিল্প স্থাপনে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে উপরের উপাদানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের অবকাঠামোতে যেমন- বিদ্যুৎ, টেলিফোন, সড়ক, রেল ও নৌ-পথের উন্নয়ন, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি বিবেচনায় আনতে হয়।

৮.৫ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের নিয়ম ও পদ্ধতি (Rules and Procedures of Small and Cottage Industry)

ছোট জায়গা, স্বল্প পুঁজি, নিজস্ব কারিগরি জ্ঞান ও পারিবারিক সহযোগিতায় কুটির শিল্প গড়ে ওঠে। এ শিল্প প্রধানত পরিবারভিত্তিক এবং উদ্যোক্তা নিজেই এর কারিগর। পারিবারিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করার অবসর সময়ে শ্রম নৈপুন্য প্রয়োগ করে তারা কুটির শিল্পের পণ্য উৎপাদন করে। এ অর্থে কুটির শিল্পকে খণ্ডকালীন উৎপাদন ইউনিট বলা যায়। অবশ্য কুটির শিল্প পূর্ণকালীন উৎপাদন ইউনিটও হতে পারে। এ শিল্প স্থাপনে তেমন কোনো নিয়ম পদ্ধতি পালন করতে হয় না বা সরকারের কোনো অনুমোদনও প্রয়োজন হয় না।

প্রয়োজনীয় সামান্য জমি, পুঁজি ও কারিগরি জ্ঞানই শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট। শিল্প প্রতিষ্ঠায় কারিগরি জ্ঞান ও উদ্যোগই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তবে শিল্প প্রতিষ্ঠার পর বিসিক-এ তালিকাভুক্ত হলে তা সরকার প্রদত্ত সাহায্য ও সহযোগিতা পেতে পারে।

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠায় সামান্য কিছু নিয়ম পদ্ধতি পালন করতে হয়। বাংলাদেশে এ শিল্পের মোট বিনিয়োগ ৮১০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। এরূপ শিল্পকর্মের জন্য ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করতে হয়। এ ছাড়াও জনস্বাস্থ্য ও বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। তবে পরবর্তীতে উদ্যোক্তার ঘোষণার ভিত্তিতে বিসিক রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতেই বিসিক শিল্প এলাকা ও সম্প্রসারণ অফিস রয়েছে। শিল্প এলাকায় জমি পেতে হলে বিসিক অফিস থেকে সরবরাহকৃত নির্ধারিত ফরম সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য অবশ্য বিভিন্ন হারে মাসুল প্রদান করতে হয়। ফরম পূরণ করে আবেদন করলে জমি বরাদ্দ কমিটি জমি বরাদ্দের বিষয় বিবেচনা করে। কমিটির প্রধান হলেন জেলা কমিশনার। বিসিক জেলা প্রধান কর্মকর্তা সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন জেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি, স্থানীয় টি এন্ড টি ও তিতাস গ্যাস প্রতিনিধি।

আবেদন পত্রের সাথে জাতীয়তার সনদ, ব্যাংক স্বচ্ছলতার সার্টিফিকেট ও প্রকল্প পরিকল্পনা সংযুক্ত করতে হয়। কমিটি এ সব বিষয়ে সন্তুষ্ট হলে জমি বরাদ্দ দেয়।

বিসিক কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হলে ক্ষুদ্র শিল্পগুলো ব্যাংক ঋণের সুযোগ পেয়ে থাকে। তাছাড়া কর অবকাশ পেতে হলে বিসিক এর নিকট থেকে রেজিস্ট্রেশন নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আবেদন করতে হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে কোন শিল্প ?

ক. হস্ত খ. কুটির

গ. ক্ষুদ্র ঘ. ক্ষুদ্র ও কুটির

২. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি ?

i. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বৃহদায়তন শিল্পের পরিপূরক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

ii. প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানির সুবিধা দিতে হবে।

iii. সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মেহরাব চট্টগ্রামের পাহাড়িয়া অঞ্চলে পুতুল, ফুলদানি, ফুলের টব ইত্যাদি তৈরির শিল্প গড়ে তুলেছেন। এ কাজে তার স্ত্রী ও কন্যা তাকে সাহায্য করে। ঐ এলাকার পরিবহণ ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় এবং স্থানীয় বাজার না থাকায় তিনি সরাসরি বাজারে পণ্য বিক্রয় করতে পারছেন না। ফলে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করা সত্ত্বেও আশানুরূপ মুনাফা অর্জন করতে পারছেন না।

৩। মেহরাবের প্রতিষ্ঠিত শিল্পটি কোন্ ধরনের ?

ক. মৃৎ শিল্প খ. ক্ষুদ্র শিল্প

গ. কুটির শিল্প ঘ. পাট শিল্প

৪। মেহরাবের শিল্পটি কোন্ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে ?

ক. তার উৎপাদিত পণ্যের মান ভাল নয়

খ. তার শিল্পটি আধুনিক যুগের সাথে মানানসই নয়

গ. উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সমস্যা হচ্ছে

ঘ. ব্যবসায়টির আধুনিকায়নে অর্থের সংকট আছে

সৃজনশীল প্রশ্ন

নারায়ণগঞ্জ শহরে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা আছে বিবেচনা করে জনাব লতিফ সেখানে একটি তেল প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন করেন। তার প্রতিষ্ঠানে ৪০ জন শ্রমিক কর্মরত আছে এবং তার বিনিয়োগকৃত মূলধন প্রায় ৮ ৮ কোটি টাকা। এ ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে লতিফ সাহেবকে প্রয়োজনীয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পালন শেষে তিনি বিসিক থেকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে ব্যবসায় পরিচালনা করছেন।

ক. জনাব লতিফের শিল্পটি কোন ধরনের শিল্প ?

খ. ক্ষুদ ও কুটির শিল্পের মধ্যে প্রধান ২টি পার্থক্য বর্ণনা কর।

গ. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে জনাব লতিফকে কী কী আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়েছে ?

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে লতিফ সাহেবের মত উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের কুটির শিল্পের ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাংকিং
Money and Banking

৯.১ অর্থের সংজ্ঞা (Definition of Money)

আদিমকালে মানুষের অভাব ছিল কম। তখন মানুষ নিজেদের প্রয়োজন মত উৎপাদন করত। সময় ও সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এসব অভাব বা চাহিদা একক প্রচেষ্টায় মিটানো সম্ভব হয় না। ফলে শ্রম বিভাগের প্রবর্তন হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি এক একটি দ্রব্য উৎপাদন করত এবং পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে তখন তারা তাদের অভাব মিটাত। কিন্তু মানুষের অভাবের অসামঞ্জস্যতা, দ্রব্যের অবিভাজ্যতা, মূল্য পরিমাপের অসুবিধাসহ নানাবিধ কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথা মানুষের লেনদেনের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে না। কালক্রমে মূল্যে পরিমাপক ও বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে অর্থের প্রচলন হয়।

পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য মাধ্যমকে অর্থ বলে। এটি রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়। সকলেই এটিকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ও ঋণ পরিশোধে ব্যবহার করে। সুতরাং বলা যায়, অর্থ এমন এক জিনিস যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। এ সংজ্ঞায় অর্থের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট: (i) অর্থ সর্বগ্রহণযোগ্য একটি বিনিময় মাধ্যম (ii) এটি মূল্যের পরিমাপক ও (iii) সঞ্চয়ের বাহন । অর্থ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত , যেমন–বাংলাদেশে টাকা, জাপানে ইয়েন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলার ইত্যাদি ।

৯.২ অর্থের কার্যাবলি (Functions of Money)

প্রাথমিক অবস্থায় অর্থের প্রধান কাজ বিনিময়ের মাধ্যম থাকলেও আধুনিককালে অর্থের কার্যাবলির বিস্তৃতি অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে অর্থ সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সবই অর্থের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অর্থের প্রধান কাজগুলো নিম্নের ছত্রযুগলের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"Money is a matter of functions four. A medium, a measure, a standard, a store" অর্থাৎ– "অর্থের কাজ হল চার প্রকার– বিনিময়ের মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভাণ্ডার"।

১। বিনিময়ের মাধ্যম : অর্থ সর্বগ্রহণযোগ্য বিনিময়ের মাধ্যম । ক্রেতা ও বিক্রেতা অর্থের মাধ্যমে পণ্য বিনিময় করে । যে কোনো সময়, যে কোনো পরিমাণ পণ্য মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা ক্রয় করতে পারে। অর্থের মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সহজ ও দ্রুততর হয়।

২। মূল্যের পরিমাপক : অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে সকল প্রকার পণ্য ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অর্থ মূল্য পরিমাপের একটি সাধারণ মাণদন্ড। অর্থের মাধ্যমে সহজেই পণ্য মূল্য নির্ধারণ করা যায়।

৩। সংরক্ষিত মান : অর্থ ভবিষ্যৎ দেনা-পাওনার মান হিসেবে কাজ করে। আধুনিককালে পণ্যের লেনদেন বেশির ভাগই ধারে হয়ে থাকে। এ সকল দেনা-পাওনার হিসাব অর্থের মাধ্যমে করা হয়। তাছাড়া ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অর্থের আংকিক মূল্যেই ঋণ প্রদান করে। কেননা অর্থের মূল্য সহজে পরিবর্তন হয় না । তাই, অর্থ সকল প্রকার স্থগিত লেনদেনের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে।

৪। সঞ্চয়ের বাহন : মানুষ তার আয়ের সবটুকুই বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করে না। আয়ের কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চায়। পণ্যের মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। কারণ, অনেক দ্রব্যই ক্ষণস্থায়ী এবং পচনশীল। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলে এর মাধ্যমে সঞ্চয় করা নিরাপদ। তাই অর্থকে সঞ্চয়ের বাহক বলা হয়।

৫। মূল্য স্থানান্তরের মান : অর্থের মাধ্যমে মানুষের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। যে কেউ অর্থের বিনিময়ে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে পারে বা ক্রয় করতে পারে।

৬। তারল্যের মান : অর্থ সর্বাপেক্ষা তরল সম্পদ। এটি সর্বজন গ্রহণীয় সম্পদ। অর্থ দ্বারা যে কোনো সময়, যে কোনো কিছু ক্রয় করা যায়। এভাবে অর্থ তারল্যের মান হিসেবে কাজ করে।

৯.৩ ব্যাংক কাকে বলে (What is a Bank)

ব্যাংক শব্দের আভিধানিক অর্থ হল নদীর তীর, স্তুপীকৃত কোন বস্তু বা ধনভাণ্ডার। তবে বাস্তবিক ও প্রায়োগিক অর্থে ব্যাংক আর্থিক ব্যবসায়ে লিপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর কাজ হল সংরক্ষণের জন্য টাকা গ্রহণ করা এবং চাহিবা মাত্র তা ফেরত দেয়া।

এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণের অব্যবহৃত বা উদ্বৃত্ত অর্থ জমা রাখে এবং প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ঋণ প্রদান করে। জনগণ তাদের গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংক চাহিবামাত্র এ অর্থ প্রদান করে।

ব্যাংক আমানত হিসেবে এক শ্রেণীর লোকের নিকট থেকে টাকা গ্রহণ করে এবং অন্য শ্রেণীর লোককে ঋণ প্রদান করে। এজন্য ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক ও ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়। অতএব, যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং অন্যদের তা ঋণ হিসেবে প্রদান করে তাকে ব্যাংক বলে।

৯.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে (What is a Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের প্রধান ব্যাংক। একে কেন্দ্র করে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মুদ্রা বাজার গড়ে উঠে। অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ এবং দেশে মুদ্রা প্রচলন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এ ব্যাংকেরই।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর অন্যতম কাজ আমানত গ্রহণ ও ঋণ দান। ঋণের পরিমাণ অধিক বা স্বল্প হলে অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের প্রতিনিধি ও আর্থিক পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অতএব, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল দেশের প্রধান ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান যা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে জনস্বার্থে দেশের মুদ্রা ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আছে। বাংলাদেশে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', ইংল্যান্ডে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড', মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম' প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদাহরণ।

৯.৫ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Central Bank)

দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষ ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গঠন ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। নিম্নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মূল কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১। নোট ও মুদ্রার প্রচলন : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অন্যতম কাজ হলো বিনিময় মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন মূল্যমানের নোট ও মুদ্রার ছাপা ও প্রচলন। যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ৳৫, ৳১০, ৳৫০, ৳১০০ ও ৳৫০০ টাকার নোট ইস্যু করে।

২। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যাংক, বীমা, ঋণদানকারী সংগঠনসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। যেমন– বাংলাদেশে কোন ব্যাংকিং বা বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতে হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রদত্ত নিয়মনীতি অনুসারে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য থাকে।

৩। ঋণ নিয়ন্ত্রণ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামত ঋণদান করতে পারে না।

৪। নিকাশ ঘর : দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে সংগঠিত চেকের মাধ্যমে লেনদেনসমূহের পারস্পরিক নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক "নিকাশ ঘর" হিসেবে কাজ করে। যেমন– উত্তরা ব্যাংকের কোন চেক প্রাপক যদি জনতা ব্যাংকে তার হিসেবে জমা দেয় তাহলে জনতা ব্যাংক সরাসরি উত্তরা ব্যাংক হতে চেকের টাকা সংগ্রহ না করে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক–এর নিকাশ ঘরের মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে আমানতকারীর হিসেবে জমা করবে।

৫। মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রক : কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা বাজারে দেশি ও বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করে দেশের মুদ্রার মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

৬। সরকারের ব্যাংকার : কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের অর্থ সংগ্রহ, সরবরাহ ও সংরক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ, লেনদেন সম্পাদন, বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কার্য সরকারের পক্ষে সম্পাদন করে। ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয়।

৭। ব্যাংকসমূহের ব্যাংক : দেশে ব্যাংকিং কার্যে নিয়োজিত ব্যাংকসমূহের অর্থের সংরক্ষক ও প্রয়োজনে ঋণদান কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, নিকাশে সাহায্য, উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা, শাখা খোলা ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করে, তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক বা ব্যাংকার বলা হয়।

৮। ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থনীতিকে সুচারুরূপে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে। যেমন– নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, চালু ব্যাংকের শাখা খোলা ও সুদের হার নির্ধারণে ব্যাংকসমূহের অভিভাবক ও নির্দেশক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। এতে করে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থার যথাযথ উন্নয়ন সাধিত হয়।

৯। প্রতিনিধিত্ব : এ ব্যাংক প্রয়োজনে দেশে বিদেশে সরকারের তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

১০ । অন্যান্য কার্যাবলি : উপরোক্ত মৌলিক কার্যাবলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের হিসাব পত্র নিরীক্ষা, আর্থিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ, কর্মসংস্থান, সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ, অর্থের স্থানান্তর, ব্যাংকিং বিষয়ে গবেষণা, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৯.৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা (Definition of a Commercial Bank)

যে ব্যাংক জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এর মূল লক্ষ্য হল অর্থ লেনদেন করে মুনাফা অর্জন করা। অর্থাৎ বাণিজ্যিক স্বার্থে পরিচালিত ব্যাংককেই বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়।

এ ব্যাংক আমানতকারীদের নিকট থেকে স্বল্প হার সুদে আমানত গ্রহণ করে এবং অপেক্ষাকৃত অধিক হার সুদে ঋণ প্রদান করে। এ ঋণ অবশ্য স্বল্প মেয়াদের হয়ে থাকে। আমানতকারীদেরকে দেয় সুদ এবং ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে

আদায়কৃত সুদের পার্থক্যই বাণিজ্যিক ব্যাংকের আয়। এভাবে আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং যে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

৯.৭ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি (Functions of Commercial Bank)

আধুনিক অর্থনীতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এ অবদান রাখতে গিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংককে কতগুলো বিশেষ কাজ সম্পাদন করতে হয়। নিচে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কয়েকটি কার্যের বিবরণ দেওয়া হল :

১। আমানত গ্রহণ : বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের নিকট বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা সঞ্চয়গুলো আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। চলতি, স্থায়ী ও সঞ্চয়ী এ হিসাবের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে। চলতি আমানতের জন্য কোন সুদ দেওয়া হয় না। সঞ্চয়ী আমানতের ওপর স্বল্প হারে এবং স্থায়ী আমানতের ওপর কিছু বেশি হারে সুদ দেওয়া হয়।

২। ঋণ দান : ঋণ দান বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান কাজ। আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ নগদ জমা রেখে বাকি অংশ ব্যাংক ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ব্যাংক উচ্চ হারে সুদ আদায় করে। এ সুদই ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস।

৩। বিনিময়ের মাধ্যম : বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারী চেক ইত্যাদি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এগুলো অর্থের মতই লেনদেনের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৪। মূলধন গঠন : মূলধন গঠনে সহায়তা করা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম কাজ। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়ানো ছিটানো অর্থ সংগ্রহ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক পুঁজি গঠন করে। মূলধন গঠন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না।

৫। হুন্ডি/ বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ : বাণিজ্যিক ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল হুন্ডি বাট্টা করা। বর্তমানে প্রচুর ব্যবসায়িক লেনদেন হুন্ডির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই টাকার প্রয়োজন হলে হুন্ডির মালিক বাণিজ্যিক ব্যাংকে হুন্ডি ভাঙাতে পারে। এজন্য অবশ্য ব্যাংক নির্দিষ্ট বাট্টা কেটে রাখে। একে হুন্ডির বাট্টাকরণ বলে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

৬। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়ের সহায়তা করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার দেনা-পাওনা নিষ্পত্তিতে সহায়তা করে। বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান, হুন্ডি বাট্টাকরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবসায় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৭। প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি : বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলের হয়ে অর্থ সংগ্রহ ও প্রদান, শেয়ার ও সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়, কর ও বীমার প্রিমিয়াম প্রদান প্রভৃতি কাজ করে থাকে।

৯.৮ আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব (Bank Account of a Depositor)

ব্যাংক জনসাধারণের নিকট থেকে আমানত হিসেবে অর্থ জমা রাখে। প্রয়োজন অনুসারে আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে নেয়। ব্যাংক এ দুই ধরনের কাজ একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা করে। ব্যাংকিং জগতে এ পদ্ধতি ব্যাংক হিসাব বা আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব নামে পরিচিত। টাকা আমানত রাখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নির্দিষ্ট নিয়ম পালন করে নিজ নামে ব্যাংকে একটি হিসাব খুলতে হয়।

সে ব্যাংকে টাকা জমা দিলে তা তার ব্যাংক হিসাবে জমা দেখানো হয় এবং উত্তোলন করলে তা তার হিসাব থেকে বিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ যে বিশেষ পদ্ধতিতে ব্যাংক আমানতকারীদের আমানত গ্রহণ করে এবং চাহিবামাত্র তা পরিশোধ করে তাকেই আমানতকারীর ব্যাংক হিসাব বলে।

৯.৯ ব্যাংক হিসাবের প্রকারভেদ (Classification of Bank Accounts)

সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোক বাস করে। এদের প্রত্যেকের পেশা, চাহিদা ও পছন্দ ভিন্ন। এ বিভিন্ন ধরনের লোকের জন্য ব্যাংকে বিভিন্ন প্রকার হিসাব খোলার ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাংকের হিসাব প্রধানত তিন প্রকার :

১. চলতি হিসাব (Current Account)

২. স্থায়ী হিসাব (Fixed Deposit Account)

৩. সঞ্চয়ী হিসাব (Savings Account)

১। চলতি হিসাব : যে হিসাবে প্রতিদিন ব্যাংক চলাকালীন সময়ে যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দেয়া যায় এবং ইচ্ছামাফিক টাকা উঠানো যায় তাকে চলতি হিসাব বলে। ব্যবসায়ীদের নিকট এ হিসাব খুবই জনপ্রিয়। এ ধরনের হিসাবে জমাকৃত অর্থের জন্য কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

ব্যবসায়ীরা নিরাপত্তার জন্যই ব্যাংকে টাকা রাখে। নগদ লেনদেন ও আদান-প্রদানের জন্য চলতি হিসাব বিশেষ সুবিধাজনক। বিশেষ করে জমাতিরিক্ত বা অন্য যে কোনো প্রকার ঋণ নেওয়ার জন্য মক্কেলকে চলতি হিসাব খুলতে হয়। এ হিসাব খুলতে অবশ্য একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়।

চলতি হিসাবের বৈশিষ্ট্য

চলতি হিসাবের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

(১) গ্রাহক ব্যাংক চলাকালীন যতবার ইচ্ছা টাকা জমা দিতে পারে এবং যতবার ইচ্ছা চেক-এর মাধ্যমে টাকা উঠাতে পারে।

(২) চলতি হিসাবে জমাকৃত টাকার ওপর কোনো সুদ দেয়া হয় না।

(৩) ব্যবসায়ী, সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান সাধারণত এ ধরনের হিসাব খুলে থাকে।

(৪) চাহিবামাত্র প্রদান করতে হয় বলে চলতি হিসাবের টাকা ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না।

(৫) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলতে হয়।

২। স্থায়ী বা মেয়াদি হিসাব : যে হিসাবে নির্দিষ্ট মেয়াদ বা সময়ের জন্য টাকা জমা রাখা হয় তাকে স্থায়ী হিসাব বা স্থায়ী আমানত বলা হয়। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে এ হিসাবের টাকা উত্তোলন করা যায় না। অবশ্য, ব্যাংকের সাথে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে স্থায়ী আমানত ভাঙানো যায়। এমতাবস্থায় আমানতকারী সুদ থেকে বঞ্চিত হয়।

স্থায়ী আমানতের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয়। সময় সীমার ওপর ভিত্তি করে সুদের হারের তারতম্য হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বে আমানতকারী প্রয়োজনে উক্ত আমানতের ৮০% পর্যন্ত ঋণ পেতে পারে। সমাজের যে সব লোকের হাতে প্রচুর অলস অর্থ থাকে তারাই এ ধরনের হিসাব খুলে।

স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাংক যে রশিদ প্রদান করে তাকে স্থায়ী আমানত বা Fixed Deposit Receipt বলে। মেয়াদান্তে আমানতকারী ব্যাংকে এ রসিদ জমা দিয়ে সুদসহ টাকা উঠাতে পারে।

স্থায়ী হিসাবের বৈশিষ্ট্য

১। ব্যাংক ও আমানতকারীর এটি একটি চুক্তি।

২। স্থায়ী আমানতের জন্য একটি রসিদ দেওয়া হয়। এই রসিদকে স্থায়ী আমানত রসিদ বলে। এ রসিদটি এ হিসাবের মূল দলিল।

৩। নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য এই হিসাবে টাকা জমা দেওয়া হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে সুদসহ টাকা উঠানো যায়।

৪। স্থায়ী হিসাবে একবারই মাত্র টাকা জমা দেয়া যায় এবং একবারই তা তোলা যায়।

৫। মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে টাকা উত্তোলন করলে সুদ দেয়া হয় না।

৬। এ হিসাবে মেয়াদ অনুসারে সুদের হার কম বেশি হয়। সুদের হার আমানত রসিদের উপর লেখা থাকে।

৩। সঞ্চয়ী হিসাব : সমাজের চাকরিজীবী, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত লোকজন এ হিসাব খুলে থাকে। ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৳১০০ টাকা জমা দিয়ে এ হিসাব খোলা যায়। নিয়মানুযায়ী সপ্তাহে দুইবার এ হিসাব থেকে টাকা উঠানো যায়। তবে অগ্রিম নোটিশ দিয়ে বিশেষ অবস্থায় টাকা উঠানো যায়। সঞ্চয়ী হিসাব দুই প্রকারের হয়ে থাকে :

ক. চেকসহ সঞ্চয়ী হিসাব

খ. চেক ছাড়া সঞ্চয়ী হিসাব

ক. চেকসহ সঞ্চয়ী হিসাব : যে সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা উঠানোর সুবিধার জন্য আমানতকারীকে কতগুলো পাতা বিশিষ্ট চেক বই প্রদান করা হয় তাকে চেকসহ সঞ্চয়ী হিসাব বলে।

খ. চেক ছাড়া সঞ্চয়ী হিসাব : যে হিসাবের মালিককে টাকা উঠানোর জন্য চেক বই এর সুবিধা দেয়া হয় না তাকে চেকবিহীন সঞ্চয়ী হিসাব বলে। মক্কেল পাস বইসহ ব্যাংকে গিয়ে টাকা উত্তোলন রসিদের মাধ্যমে টাকা তুলতে পারে।

সঞ্চয়ী হিসাবের বৈশিষ্ট্য

(১) অপেক্ষাকৃত কম টাকা দিয়েই সঞ্চয়ী হিসাব খোলা হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে এ জমার পরিমাণ ৳১০০ টাকা।

(২) ব্যাংক চলাকালীন যতবার ইচ্ছা এ হিসাবে টাকা জমা দেয়া যায়। কিন্তু, সপ্তাহে দু'বারের বেশি টাকা উঠানোর নিয়ম নেই। অবশ্য, সংশ্লিষ্ট শাখার ব্যাংক ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে সপ্তাহে দু'বারেরও বেশি টাকা উঠানো যায়।

(৩) এ হিসাব থেকে একসাথে ৳২০ হাজার টাকার বেশি টাকা তোলা যায় না। এর অধিক টাকা তুলতে হলে ব্যাংক ম্যানেজারের পূর্ব অনুমতি নিতে হয়।

(৪) সঞ্চয়ী হিসাবের মালিককে পাস বই সরবরাহ করা হয়। অবশ্য বর্তমানে কম্পিউটারাইজড ব্যাংক বিবরণী দেয়া হয়।

(৫) সঞ্চয়ী হিসাবে জমা টাকার ওপর বছরে জুন ও ডিসেম্বরে দু'বার সুদ দেওয়া হয়।

৯.১০ ব্যাংকে হিসাব খোলার নিয়ম (Procedure of Opening Bank Account)

ব্যাংক হিসাব খোলার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাব জনগণের মধ্যে সুপ্রচলিত। উভয় প্রকার হিসাব খোলার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি প্রচলিত আছে :

১। হিসাব খোলার আবেদন : ব্যাংকে হিসাব খোলার জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। আবেদন ফরম ব্যাংক সরবরাহ করে। এতে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পেশা উল্লেখ করতে হয় এবং কী ধরনের ব্যাংক হিসাব খুলবে তার উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক। আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর সদ্য তোলা তিন কপি ছবি জমা দিতে হয়।

২। নমুনা দস্তখত কার্ড পূরণ : ব্যাংক একটি কার্ডে আবেদনকারীর নামসহ তিনটি নমুনা দস্তখত সংগ্রহ করে। স্বাক্ষর করা কার্ডটি ব্যাংক যত্নসহকারে জমা রাখে। এ নমুনা স্বাক্ষর দিয়েই চেক কেটে ব্যাংক হতে টাকা তুলতে হয়।

৩। প্রয়োজনীয় দলিলপত্র দাখিল : আবেদনকারী কোনো ব্যক্তি না হয়ে কোনো প্রতিষ্ঠান হলে ব্যাংকের নিকট কতগুলো প্রয়োজনীয় দলিল দাখিল করতে হয়। অংশীদারি কারবারের ক্ষেত্রে তার চুক্তিনামার কপি এবং যে হিসাব পরিচালনা করবে তার নাম পেশ করতে হবে। কোম্পানির ক্ষেত্রে তার সংঘ-স্মারক, সংঘ-বিধি, কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র প্রভৃতি

এবং যে ব্যক্তি ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করবে তার নাম দিয়ে পরিচালক পর্ষদের সভার সিদ্ধান্তের একটি কপি ব্যাংকের নিকট জমা দিতে হয়। অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার গঠনতন্ত্র (যদি থাকে)-এর কপি এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তের একটি কপি অথবা কমিটির অবর্তমানে প্রতিষ্ঠান প্রধানের প্রয়োজনীয় নির্দেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হয়। এ ক্ষেত্রেও যে হিসাব পরিচালনা করবে তার নাম পেশ করতে হয়।

৪। সুপারিশ : এটি ব্যাংক হিসাব খোলার আর একটি মূল্যবান শর্ত। ব্যাংকে হিসাব রয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে আবেদনকারীর পরিচিতির সুপারিশ করতে হবে। আবেদনকারীর পরিচিতির এরূপ সুপারিশ ছাড়া ব্যাংক তার নামে হিসাব খুলবে না।

৫। প্রাথমিক আমানত : ব্যাংকে হিসাব খোলার সময় আবেদনকারীকে প্রাথমিক আমানত হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিতে হয়। চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে এ জমার পরিমাণ কমপক্ষে ৳ ১০০০ টাকা এবং সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৳ ১০০ টাকা।

৬। চেক ও পাস বই প্রদান : প্রাথমিক আমানত ও উপরের নিয়মাবলি পালন করার পর ব্যাংকের সাথে আবেদনকারীর ব্যাংকার ও গ্রাহক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে ব্যাংক আমানতকারীকে একটি চেক বই, একটি পাস বই ও একটি টাকা জমা দেয়ার রসিদ বই সরবরাহ করে থাকে। চলতি হিসাবে কোন পাস বই দেয়া হয় না।

উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যাংকে সঞ্চয়ী বা চলতি হিসাব খুলতে হয়। কিন্তু, স্থায়ী হিসাব খোলার জন্য আমানতকারীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিয়ে FDR (স্থায়ী জমা রসিদ) সংগ্রহ করতে হয়। ন্যূনতম কত টাকার স্থায়ী হিসাব খুলতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে বড় অংকের টাকার স্থায়ী আমানত খোলা হয়। এ জন্য আবেদনকারীকে ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত একটি ফরম পূরণ করে তার সাথে নির্দিষ্ট অংকের টাকা জমা দিয়ে FDR সংগ্রহ করতে হয়। ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত FDR এ-এর মেয়াদ, এর টাকার পরিমাণ, এর ওপর পরিশোধ্য সুদের হার প্রভৃতির উল্লেখ থাকে।

৯.১১ ব্যাংকের পাস বই (Bank Pass Book)

ব্যাংকের পাস বই ব্যাংক কর্তৃক আমানতকারীকে প্রদত্ত একটি ছোট হিসাবের বই। এতে আমানতকারীর লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়। হিসাব খোলার পর ব্যাংক আমানতকারীকে পাস বই সরবরাহ করে। ব্যাংকের নিকট আমানতকারীর ব্যাংক হিসাবের যে খাতা থাকে পাস বই ঠিক তার অনুলিপি। এতে বিভিন্ন তারিখে জমা ও উত্তোলনকৃত টাকার পরিমাণ, উদ্বৃত্ত জমাকৃত ও কর্তিত সুদের পরিমাণ প্রভৃতি উল্লেখ থাকে।

ব্যাংকের পাস বই–এর একটি পৃষ্ঠার নমুনা

তারিখ	বিবরণ	উঠানোর পরিমাণ		জমার পরিমাণ		নীট জমা/উদ্বৃত্ত		স্বাক্ষর
		টাকা	পয়সা	টাকা	পয়সা	টাকা	পয়সা	

৯.১২ টাকা জমা দেয়ার নিয়ম (Procedure of Depositing Money)

ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার জন্য ছাপানো জমার রসিদ বই থাকে। হিসাব খোলার পর ব্যাংক বিনামূল্যে আমানতকারীকে টাকা জমা দেয়ার একটি রসিদ বই সরবরাহ করে থাকে। টাকা জমাদানকালে আমানতকারী উক্ত রসিদে তার নাম, তারিখ, হিসাব নম্বর, টাকার পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করে। অতঃপর টাকাসহ রসিদ বই ব্যাংকের নগদান কাউন্টার ফয়েলে স্বাক্ষর প্রদান করে বইটি আমানতকারীকে ফেরত দেয় এবং ব্যাংক কর্মচারি তার হিসাবে উক্ত টাকা জমা করে নেয়। উল্লেখ্য, আমানতকারী চেক, বিল ড্রাফ্‌ট ইত্যাদিও তার হিসাবে জমা দিতে পারে। আমানতকারীর ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট থেকে উক্ত চেক বা ড্রাফ্‌টের টাকা সংগ্রহ করে তা তার হিসাবে জমা করে।

টাকা জমা দেয়ার ফরম–এর নমুনা

এস, বি–২

সোনালী ব্যাংক

নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা

সঞ্চয়ী হিসাব নং .... তাং ....

হিসাবের নাম ....

চেক / নগদ টাকার বিবরণ	টাকা	পয়সা
মোট টাকা		

কথায় ....

ক্রমিক নং ক্যাশিয়ার অফিসার

এস, বি–২ মনোগ্রাম নগদ / হস্তান্তর

সোনালী ব্যাংক

নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা, তাং ....

লেজার নং ..... সঞ্চয়ী হিসাব নং [ ]

পৃঃ .... স্বাক্ষর ....

হিসাবের নাম ....

চেক / নগদ টাকা বিবরণ	টাকা	পয়সা
মোট টাকা		

কথায় ....

ক্রমিক নং ক্যাশিয়ার অফিসার জমাকারীর স্বাক্ষর

৯. ১৩ ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন পদ্ধতি (Procedures of Withdrawing Money from Bank)

ব্যাংক সঞ্চয়ী ও চলতি হিসাবের মালিককে কতিপয় পৃষ্ঠা (১০, ২৫, ৫০) সংবলিত চেক বই প্রদান করে। চেকের প্রতি পাতায় ব্যাংকের কর্মচারিই হিসাব নম্বর লিখে দেয়। আমানতকারী ব্যাংকের ওপর চেক লিখে তার হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করে থাকে।

চেকে আমানতকারীকে তারিখ, প্রাপকের নাম (নিজে প্রাপক হলে যথাস্থানে 'নিজ' কথাটি উল্লেখ), টাকার পরিমাণ (কথায় ও অঙ্কে) এবং স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। এ স্বাক্ষর হিসাব খোলার সময়ে প্রদত্ত নমুনা স্বাক্ষরের অনুরূপ হতে হবে। এ ছাড়া চেকের উল্টা পৃষ্ঠাতে প্রাপককে দুটি স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। লিখিত চেক ব্যাংকের নির্ধারিত কাউন্টারে জমা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারি চেকটি রেখে প্রাপককে নির্দিষ্ট নম্বরবিশিষ্ট একটি পিতলের টোকেন প্রদান করে। এরপর ব্যাংকের কর্মচারি চেকে লিখিত টাকা আমানতকারীর হিসাবে ডেবিট করে এবং আর একজন দায়িত্বশীল কর্মচারি আমানতকারীর নমুনা স্বাক্ষরের সাথে চেকে প্রদত্ত স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখেন। উভয় স্বাক্ষরের মধ্যে কোনরূপ গরমিল না থাকলে তিনি চেকটি পাস করে ক্যাশ কাউন্টারে প্রেরণ করেন। আমানতকারী বা প্রাপক টোকেনটি ক্যাশিয়ারের নিকট প্রদান করলে ক্যাশিয়ার তাকে চেকে লিখিত টাকা প্রদান করে।

৯.১৪ চেক কী (What is Cheque)

ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত দলিলকে চেক বলে। এটি টাকা উত্তোলনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত এক প্রকার ছাপানো কাগজ। আমানতকারী নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদানের জন্য তার ব্যাংকের প্রতি যে শর্তহীন আদেশপত্র দেয় তাকে চেক বলা হয়। আমানতকারী বা প্রাপক আইন অনুযায়ী ব্যাংকে চেক উপস্থাপন করলে ব্যাংক তাকে টাকা প্রদানে বাধ্য থাকে। এক কথায় বলা যায়, আমানতকারী নিজেকে বা কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রদান করার জন্য ব্যাংকের ওপর যে লিখিত ও শর্তহীন আদেশ প্রদান করে থাকে তাকে চেক বলে।

৯.১৫ চেক লিখন (Writing a Cheque)

নিচে চেক লিখনের নিয়মাবলি আলোচনা করা হল :

১। **হিসাব নম্বর :** চেক বই সরবরাহ করার সময় ব্যাংক কর্তৃক চেকে হিসাব নম্বর লিখে দেয়া হয়। তবুও চেকের লেখককে প্রথমেই লক্ষ রাখতে হবে চেকে সঠিক হিসাব নম্বর লেখা আছে কিনা।

২। **তারিখ প্রদান :** চেকের ডান পাশের উপরের কোণায় নির্দিষ্ট স্থানে তারিখ লেখা হয়। আমানতকারীকে চেকে অবশ্যই তারিখ লিখতে হবে। তারিখবিহীন চেকের টাকা ব্যাংক প্রদান করে না।

৩। **প্রাপকের নাম :** চেকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রাপকের নাম লিখতে হবে। প্রাপক চেক সম্পাদনকারী নিজে বা অন্য কোনো ব্যক্তি হতে পারে। এ স্থলে আমানতকারী 'নিজ' বা অন্য কোনো ব্যক্তির নাম লিখে চেক পূরণ করে। চেকের নামের ডান পাশে বাহককে অথবা আদেশ অনুসারে প্রভৃতি শব্দ লেখা থাকে।

৪। **টাকার অঙ্ক উল্লেখ :** চেকে টাকার পরিমাণ কথায় ও অংকে লিখতে হয়। কথায় ও অঙ্কে লেখা টাকার পরিমাণের মধ্যে কোনরূপ গরমিল হলে ব্যাংক চেকের টাকা প্রদান করে না অর্থাৎ চেকটি ব্যাংক কর্তৃক অমর্যাদাকৃত হয়।

৫। **স্বাক্ষর :** আমানতকারীকে চেকের নিচে ডান কোণায় স্বাক্ষর করতে হয়। স্বাক্ষরবিহীন চেকের কোন মূল্য নেই। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা চেকের স্বাক্ষর ও আমানতকারীর পূর্বে দেয়া নমুনা স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখে। উভয় স্বাক্ষরের মধ্যে মিল থাকলে ব্যাংক প্রাপককে টাকা পরিশোধ করে। কিন্তু, উভয় স্বাক্ষরের মধ্যে গরমিল ধরা পড়লে ব্যাংক চেকের টাকা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে।

৯. ১৬ চেকের প্রকারভেদ

চেক প্রধানত দুই প্রকারের, যথা− (ক) বাহকের চেক ও (খ) হুকুম চেক। উভয় প্রকার চেককে আবার দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত করা যায়। সুতরাং দাগকাটা চেককে এক প্রকার চেক বলে গণ্য করা যেতে পারে।
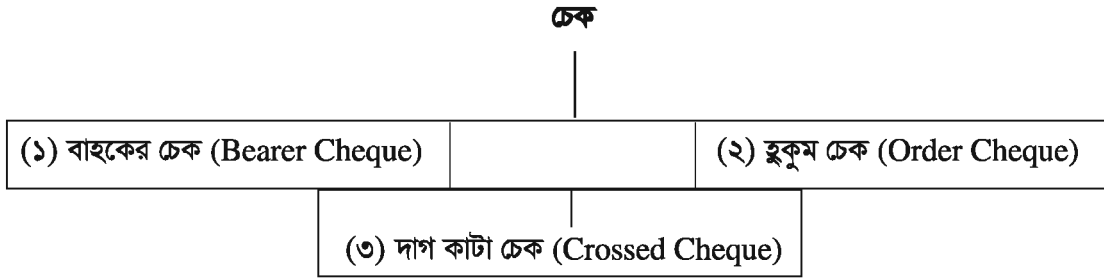
১। বাহকের চেক : যে চেকে প্রাপকের নামের স্থানের পরে 'অথবা বাহককে' কথাটি লেখা থাকে, তাকে বাহকের চেক বলা হয়। যে কোনো বহনকারী বা বাহক এ চেক ব্যাংকে জমা দিবে, ব্যাংক তাকেই টাকা পরিশোধে বাধ্য থাকবে। নিচে বাহকের চেকের নমুনা দেখানো হল :

সোনালী ব্যাংক
নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা

সঞ্চয়ী হিসাব নং

নং এস বি ৩৮৪৪৭ ৮৯৭৫

তারিখ : ২৩.০৮.২০০৮

প্রদান করুন জনাব মোঃ আব্দুর রহমান...কে অথবা বাহককে

পাঁচ হাজার টাকা মাত্র .... ।

টাকা = ৳৫,০০০/- হাবিব

বাহক চেকের বৈশিষ্ট্য

(১) এই চেকে প্রাপকের নামের পরে 'অথবা বাহককে' কথাটি লেখা থাকে।

(২) হাত বদলের দ্বারা চেকটি হস্তান্তরিত হয়।

(৩) চেকটি ব্যাংকে উপস্থাপন করলে ব্যাংক বাহককে টাকা দিতে বাধ্য থাকে।

(৪) বাহককে টাকা তোলার সময় চেকের বিপরীত পৃষ্ঠায় দুটো দস্তখত দিতে হয়।

(৫) প্রাপকের নাম না লিখে এ স্থলে নিজ বা নগদ টাকা ইত্যাদি শব্দ লেখা যায়।

(৬) যে কোনো পক্ষ এই চেককে দাগকাটা চেকে রূপান্তরিত করতে পারে।

২। হুকুম চেক : যে চেকে প্রাপকের নামের পরে 'অথবা আদেশে' কথাটি লেখা থাকে তাকে আদেশ চেক বলে। হুকুম চেকের টাকা ব্যাংক চেকে উল্লেখিত ব্যক্তি অথবা লিখিত অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তিকেই প্রদান করে। পরের পৃষ্ঠায় একটি হুকুম চেকের নমুনা দেখানো হল :

হুকুম চেকের নমুনা

পূবালী ব্যাংক
নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা

গ. চেক ৫৭৯২১ সঞ্চয়ী হিসাব নং
পঙ্গ/১০ নং এস বি ৩৮৪৪৭ ৮৯৭৫
তারিখ : ২৩.০৮.২০০৮
প্রদান করুন জনাব মোঃ পিয়ার আলী...কে অথবা আদেশানুসারে
টাকা– তিন হাজার টাকা..
....
টাকা = ৳৩,০০০/- রহমান

হুকুম চেকের বৈশিষ্ট্য

নিচে হুকুম চেকের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা হল :

(১) হুকুম চেকে প্রাপকের নামের শেষে 'অথবা আদেশানুসারে' কথাটি লেখা থাকে।

(২) প্রাপক নিজে অথবা তার আদেশানুসারে অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যাংকে এ চেক প্রদান করলে ব্যাংক তাকে টাকা পরিশোধ করবে।

(৩) প্রাপক চেকের উল্টা পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করে অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ প্রদান করতে পারে। প্রাপকের অনুমোদন ব্যতীত চেক হস্তান্তর করা যায় না।

৩। দাগকাটা চেক : বাহক চেক অথবা হুকুম চেকের উপরের বাম কোণে আড়াআড়িভাবে দুটো সমান্তরালে রেখা টানা হলে তাকে দাগকাটা চেক বলে। রেখা দু'টির মধ্যে "প্রাপকের হিসাবে দেয়", "এন্ড কোঃ" প্রভৃতি লেখা থাকতেও পারে, নাও পারে। কেবল রেখাদ্বয় অঙ্কনই দাগকাটা চেক হওয়ার জন্য যথেষ্ট। দাগকাটা চেকের টাকা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হয়। দাগকাটা চেক নিরাপদ। কারণ যে কেউ ইচ্ছা করলেই চেকের টাকা উঠাতে পারে না।

দাগকাটা চেকের নমুনা

পঙ্গ/১০ No. 522
প্রাপকের হিসাবে দেয় / এন্ড কোঃ

পূবালী ব্যাংক
নিউ মার্কেট শাখা, ঢাকা
সঞ্চয়ী হিসাব নং
৮৯৭৫
তারিখ : ০৩.০৮.২০০৮
প্রদান করুন জনাব মোঃ আবদুল করিম কে অথবা বাহককে
....
টাকা দশ হাজার মাত্র...
....
টাকা = ৳১০,০০০/- জসিম উদ্দিন

৯. ১৭ ব্যাংক ড্রাফট (Bank Draft)

এক স্থান হতে অন্যস্থানে নিরাপদে দ্রুত টাকা পাঠানোর জন্য ব্যাংক ড্রাফট অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি। ব্যাংক কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চাহিবামাত্র প্রদানের জন্য তার যে কোনো শাখার ওপর যে আদেশ প্রদান করে তাকে ব্যাংক ড্রাফট বলে। চাহিবামাত্র টাকা প্রদানের নির্দেশ থাকায় এটাকে Demand Draft বলা হয়।

ব্যাংক ড্রাফট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত ও স্বাক্ষরিত এবং উক্ত ব্যাংকের অন্য স্থানের কোনো শাখার ওপর চাহিবামাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পরিশোধের আদেশনামা। বিশেষ ব্যাংক ড্রাফট প্রাপক আদিষ্ট শাখায় উপস্থাপন করলে উক্ত শাখা ব্যাংক তাকে ড্রাফটের টাকা প্রদান করে। সকল দেশেই ব্যবসায়িক লেনদেন নিষ্পত্তিতে ব্যাংক ড্রাফট ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। মনে করি, করিম ঢাকা থেকে খুলনায় রহিম নামক এক পাওনাদারকে ৳১০,০০০ টাকা পাঠাতে চায়। ধরা যাক, করিম, ঢাকার অগ্রণী ব্যাংকের কোনো শাখায় ব্যাংকের কমিশনসহ ৳১০,০০০ টাকা জমা দিলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রাপকের অনুকূলে তাদের খুলনা শাখার ওপর উক্ত টাকার একটি ড্রাফট ইস্যু করে তাকে (করিমকে) প্রদান করবে। করিম ড্রাফটি খুলনার রহিমের কাছে পাঠালে রহিম তা খুলনার আদিষ্ট শাখায় উপস্থাপন করে উক্ত টাকা সংগ্রহ করতে পারবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। চেক প্রধানত কত প্রকার ?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

২। ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ওপর সুদ না দেয়া কোন হিসাবের বৈশিষ্ট্য ?

i. চলতি হিসাব ii. সঞ্চয়ী হিসাব
iii. স্থায়ী হিসাব

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

৩। চলতি আমানতের টাকা ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ–

i. সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান এই ধরনের হিসাব খুলে থাকে
ii. গ্রাহকের জমাকৃত টাকার উপর কোনো সুদ দেওয়া হয় না
iii. গ্রাহক চাহিবামাত্র অর্থ প্রদান করতে হয়

নিচের কোন্‌টি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

৪। মিসেস আফসানা চৌধুরি একজন গৃহিণী। তার স্বামী ৫ বছর যাবৎ আমেরিকায় থাকেন। তাদের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে খরচ করার জন্য মিসেস আফসানা ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে চান। তাঁর জন্য কোন ব্যবস্থা উপযুক্ত হবে ?

ক. সঞ্চয়ী হিসাব খোলা খ. চলতি হিসাব খোলা
গ. স্থায়ী হিসাব খোলা ঘ. প্রাইজবণ্ড ক্রয় করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব হারুন একজন চাল ব্যবসায়ী। তিনি প্রতিদিন ৳ ১–২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লেনদেন করে থাকেন। তার ন্যাশনাল ব্যাংকে একটি ব্যাংক হিসাব আছে। জনাব হারুনের বন্ধু জনাব শফিকের কাঁচামালের আড়ৎ আছে। তার লেনদেন দৈনিক ৳১০–২০ হাজার টাকার মত। তিনি তার আড়তের পার্শ্বে অবস্থিত উত্তরা ব্যাংক লি: এ একটি সঞ্চয়ী হিসাব খুলেছেন। সেখান থেকে প্রতিদিন দুই বারের বেশি এবং পূর্বানুমতি ছাড়া একসাথে ৳২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকার বেশি অর্থ উত্তোলন করতে পারেন না। সুদ না পেলেও জনাব হারুন তার ব্যাংক হিসাব থেকে দিনে যতবার ইচ্ছা অর্থ উত্তোলন করতে পারেন। জনাব শফিকের মাসিক আয় ও ব্যয় প্রায় ৳১০,০০০ টাকা। জনাব শফিক তার ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য একটি চলতি হিসাব খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

ক. ব্যাংক হিসাব কাকে বলে ?
খ. ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী হিসাবে বিদ্যমান ২টি সীমাবন্ধতা বা অসুবিধার বর্ণনা দাও।
গ. জনাব শফিক চলতি হিসাব খুলে তার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা পেতে পারেন ?
ঘ. 'ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী হিসাব নয়, চলতি হিসাবই সুবিধাজনক' তুকি কি এ বক্তব্য সমর্থন কর ? যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়

বীমা
Insurance

১০.১ বীমা কী (What is Insurance)

বীমা এক প্রকার ব্যবসায়। এটি লেনদেনের ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধক দূর করে লেনদেন সম্প্রসারণে সাহায্য করে। ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত। মূল্যহ্রাস, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জাহাজডুবি ইত্যাদি কারণে ব্যবসায়ীকে ক্ষতির কবলে পড়তে হতে পারে। এরূপ অনিশ্চিত ক্ষতি থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা হিসেবে বীমার উদ্ভব। এ ব্যবস্থায় বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতার লেনদেনের সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতা বীমাকারীকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে এবং ভবিষ্যতে বীমাগ্রহীতার ক্ষতি হলে বীমাকারীর আর কোনো দায়িত্ব থাকে না।

সুতরাং, বীমা বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি যার ফলে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারী কোনো ঘটনা বা বিশেষ পরিস্থিতিজনিত কারণে বীমাগ্রহীতার বীমাকৃত বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি হলে তা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাকারী বীমাগ্রহীতার আকস্মিক মৃত্যুতে বীমাকৃত টাকা তার মনোনীত ব্যক্তিকে বা বীমার মেয়াদান্তে বীমাগ্রহীতাকে পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, জনাব আরিফ হোসেন বীমাগ্রহীতা এবং দি পিপলস ইনসিওরেন্স কোং লিঃ বীমাকারী। উভয়ের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি হল, প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে ৮১২ হাজার টাকা প্রিমিয়াম পরিশোধ করলে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের সমুদ্রপথে প্রেরিতব্য পণ্য সামুদ্রিক দুর্যোগের কারণে বিনষ্ট হলে তাকে (প্রথম পক্ষকে) অনধিক দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে। বস্তুতঃপক্ষে, ক্ষতি হলে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে অনধিক ৮২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিবে। কিন্তু ক্ষতি না হলে বীমাকারীর আর কোনো দায়িত্ব থাকবে না।

১০.২ বীমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলি (Essential Conditions of Insurance Contract)

নিচে বীমাচুক্তির অত্যাবশীয় শর্তগুলো বর্ণনা করা হল :

১। বীমাযোগ্য স্বার্থ : (Insurable Interest) বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার যে স্বার্থ থাকে তাকে বীমাযোগ্য স্বার্থ বলে। কোনো বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলে সে উক্ত বিষয়বস্তু বীমাকৃত করতে পারবে না। বীমাযোগ্য স্বার্থ অবশ্য আর্থিক হতে হবে। স্ত্রীর জীবনের ওপর স্বামীর এবং স্বামীর জীবনের ওপর স্ত্রীর বীমাযোগ্য স্বার্থ বিদ্যমান। একের অবর্তমানে অন্যের আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এজন্য একে অন্যের জীবন বীমা করতে পারে। নৌ-বীমা, অগ্নিবীমার ক্ষেত্রেও বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

২। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস : (Utmost good Faith) বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে একে অন্যের নিকট বীমাচুক্তির শর্তাবলি ও বিষয়বস্তুর খুঁটিনাটি প্রকাশ করার পর বীমাচুক্তি কার্যকরী হবে, অন্যথায় তা বাতিল (Void) বলে গণ্য হবে। বীমাগ্রহীতাকে বীমার বিষয়বস্তুর সবকিছু খুঁটিনাটি বিবরণ বীমাকারীর নিকট অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দরকারি সংবাদ গোপন রাখলে বীমাকারীর পক্ষে সঠিকরূপে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। অথবা, গোপন সংবাদটি পেলে বীমাকারী হয়ত বা এরূপ বিষয়বস্তু বীমাকৃত করত না।

৩। ক্ষতিপূরণের শর্ত : (Principle of Indemnity) জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। যেমন– অগ্নিবীমা ও নৌ-বীমার ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ঘটনার ফলে বীমাকৃত বিষয়স্তুর ক্ষতি হলে বীমাকারীকে তা পূরণ করতে হয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর কোনো ক্ষতি না হলে বীমাকারীর কোনো দায়িত্ব থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সবটাই বীমাকারীর লাভ। কিন্ত, জীবন বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়। এ ক্ষেত্রে বীমাকৃত টাকা বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তির নিকট অথবা পলিসির মেয়াদান্তে লাভসহ বীমাকৃত টাকা বীমাগ্রহীতার নিকট বীমাকারীকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৪। প্রতিদান : (Considaration) প্রতিদান ছাড়া কোনো সম্মতি চুক্তি হতে পারে না। বীমাচুক্তির প্রতিদান হিসেবে তাই বীমাগ্রহীতা বীমাকারীকে নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ করবে।

৫। সময় : (Time) ঝুঁকি আরম্ভ ও সমাপ্তির সময় উল্লেখ বীমাচুক্তির একটি মূল্যবান শর্ত। নৌ-বীমা ও অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিষয়বস্তু বীমা করা হয়। সময় শেষ হলে চুক্তির অবসান ঘটে। এমনকি, নৌ-বীমার অভিযাত্রা বীমাপত্রের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জাহাজের নির্দিষ্ট সমুদ্রযাত্রা শেষ হলে বীমাচুক্তির অবসান ঘটে।

১০.৩ বীমার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Insurance)

ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত। এক মুহূর্ত পর কী ঘটবে তা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারে না। 'আজ আমীর, কাল ফকির' হবার ঘটনা জগতে বিরল নয়। অগ্নিকাণ্ড, জাহাডুবি বা অন্য কোনো দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়। এরূপ ধ্বংসাত্মক অবস্থার উপশমকারী ব্যবস্থা হিসেবে বীমার উদ্ভব।

নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলোতে ব্যবসায়িক, ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বীমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হল :

ক. বীমার ব্যবসায়িক গুরুত্ব

১। ঝুঁকির নিরাপত্তা ও ব্যবসায় সম্প্রসারণ : বীমা ঝুঁকির প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যবসায়িক লেনদেন সম্প্রসারণে সাহায্য করে। বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যবসায়ী ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। অগ্নিকাণ্ড, জাহাজডুবি, মূল্যহ্রাস বা অন্য কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমাকারী তা পূরণ করে দেয়। এরূপ নিরাপত্তার কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

২। ঝুঁকি বণ্টন, স্বল্প পুঁজি, অধিক নিরাপত্তা : বীমা ঝুঁকি বণ্টন ও ক্ষতি পূরণের এক সমবায় ব্যবস্থা। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, জাহাজেও দু-একটা ক্ষতির ঘটনা কখনো বা ঘটে থাকে। আসলে বহুসংখ্যক বীমাগ্রহীতার নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের অর্থে দু-একটি বড় ধরনের ক্ষতিপূরণ করা হয়। কাজেই বীমার মাধ্যমে স্বল্প প্রিমিয়ামের বিনিময়ে অধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়।

৩। বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন : প্রিমিয়াম হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বীমা কোম্পানি উৎপাদন উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করে থাকে। এ ব্যবস্থা দেশের শিল্পায়নে সাহায্য করে।

৪। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার : বীমা ব্যবস্থা সামুদ্রিক বিপদ-আপদের বিপক্ষে জাহাজ, জাহাজ ভাড়া ও পণ্যদ্রব্য বীমা করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করে।

৫। শ্রমিক কল্যাণ : শিল্প মালিকরা কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের জন্য জীবন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, যৌথ বীমা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে তাদের ও তাদের পরিবার পরিজনের কল্যাণ সাধন করে। কাজেই, দুর্ঘটনাজনিত কারণে আকস্মিকভাবে কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার পরিবারের সদস্যরা বেঁচে থাকার অবলম্বন পায়।

৬। শিল্পের নিরাপত্তা : অগ্নিবীমা, দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি শিল্প কারখানা ও সম্পদাদির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শিল্পের অগ্রগতি সাধিত হয়। উৎপাদন ও বণ্টন বৃদ্ধি পায়।

খ. ব্যক্তি জীবনে বীমার প্রয়োজনীয়তা

১। পারিবারিক নিরাপত্তা, বার্ধক্যের ও বিশেষ প্রয়োজন মিটানো : জীবন বীমা পারিবারিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকালমৃত্যু হলে তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যারা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। বীমাকৃত অর্থের বলে তারা সমাজে টিকে থাকতে পারে। তাদেরকে অপরের গলগ্রহ হতে হয় না। বীমা বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ প্রাপ্ত বীমাকৃত অর্থে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারে। তাছাড়া, ছেলেমেয়ের বিয়ে, লেখাপড়া ইত্যাদি বিশেষ ব্যবস্থার খরচ মিটানোর জন্য বীমার ভূমিকা অতুলনীয়। এজন্য অনেক পিতা-মাতা, ছেলেমেয়ের জন্য মেয়াদি বীমাপত্র সংগ্রহ করে থাকে।

২। ব্যক্তিগত সম্পদ রক্ষা : দুর্ঘটনা বীমা, অগ্নিবীমা ইত্যাদির সাহায্যে মানুষ ব্যক্তিগত সম্পদের বিনষ্টজনিত ক্ষতিপূরণ করতে পারে। যেমন, প্রাইভেট কার -এর মালিক তার কার দুর্ঘটনার বিপক্ষে বীমা করে রাখে। দুর্ঘটনার ফলে গাড়ি নষ্ট হলে সে বীমা কোম্পানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ পায়।

৩। সঞ্চয় বৃদ্ধি : বীমা ব্যবস্থা সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করে। প্রিমিয়ামের অর্থ পরিশোধের জন্য বীমাগ্রহীতা সঞ্চয় করে। এই অর্থ বীমাকারীর মাধ্যমে উৎপাদন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়।

গ. বীমার সামাজিক গুরুত্ব

১। জাতীয় সম্পদ রক্ষা : বীমা একটি দেশের জাতীয় সম্পদ রক্ষায় সাহায্য করে। শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য সম্পদাদি বীমা করার ফলে এ সবের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। যেমন– বীমাকৃত পাটের গুদাম ও গুদামে সংরক্ষিত বীমাকৃত পাট অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হলে বীমা কোম্পানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়া যায়। ফলে গুদামের মালিক ও পাটের মালিক ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি : সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকির বিপক্ষে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে বীমা দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। বীমার ছত্রছায়ায় অনেক ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প, বাণিজ্য গড়ে ওঠে। এতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩। কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব হ্রাস : বীমা ব্যবস্থা দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশে সাহায্য করে। এতে দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বেকারত্ব হ্রাস পায়। তাছাড়া, বীমা ব্যবসায়ে বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

৪। জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি : বীমার বদৌলতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

৫. মুদ্রাস্ফীতি রোধ : বীমা দুভাবে মুদ্রাস্ফীতি রোধে সাহায্যে করে। প্রথমত বীমা কোম্পানি প্রিমিয়ামের মাধ্যমে প্রচুর অতিরিক্ত নগদ অর্থ বাজার থেকে তুলে নিয়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। দ্রব্যমূল্য নিম্নগামী হয়। দ্বিতীয়ত বীমার কারণে অধিক তহবিল উৎপাদন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

পরিশেষে বলা যায়, বীমা একজন ব্যক্তি, একটি পরিবার, একটি সমাজ ও দেশের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করে। শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে প্রত্যেক দেশে বীমার কদর বেড়ে চলেছে। বীমা ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার প্রতিষেধক এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির নিরাপত্তা ও উন্নতির অন্যতম সহায়ক।

১০.৪ বীমার প্রকাভেদ (Types of Insurance)

বীমা প্রধানত তিন প্রকার, যথা– ১. নৌ-বীমা ২. অগ্নিবীমা ৩. জীবন বীমা। এ ছাড়া প্রত্যেক দেশেই অন্যান্য আরও কয়েক প্রকার বীমার প্রচলন রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে– ১. দুর্ঘটনা বীমা ২. অপহরণ বীমা ৩. সততা বীমা ৪. শস্য বীমা ৫. শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ঝুঁকি বীমা প্রভৃতি। নিম্নোক্ত পরিচ্ছেদগুলোতে বিভিন্ন প্রকার বীমা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

১. নৌ–বীমা (Marine Insurance) : সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলের সময় সামুদ্রিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, চুরি, জল-দস্যুর আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে জাহাজ, জাহাজের পণ্যদ্রব্য ও জাহাজ ভাড়ার ক্ষতি হতে পারে। এ প্রকার অনিশ্চিত ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে যে বীমা করা হয় তাকে নৌ–বীমা বলে। এ ক্ষেত্রে বীমাকারী বা বীমা কোম্পানি নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাদের জলযান, পণ্যদ্রব্য ও জাহাজ ভাড়া বীমা করে থাকে। বীমা চুক্তি অনুযায়ী বীমাগ্রহীতা বীমা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পরিশোধ করে এবং কোনো বিশেষ ঘটনা বা পরিস্থিতির কারণে বীমার বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানি উক্ত ক্ষতিপূরণ করে। ক্ষতি না হলে বীমা কোম্পানি বা বীমাকারীর কোনো দায়িত্ব থাকে না। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সবটাই তার লাভ। নৌ–বীমার ক্ষেত্রে বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ এবং বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারী উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। বীমা কোম্পানি বীমা চুক্তির শর্তাবলি সংবলিত দলিল বীমাগ্রহীতার নিকট প্রদান করে। নৌ-বীমা চুক্তিতে এই দলিলকে বলা হয় নৌ–বীমাপত্র। নৌ–বীমাপত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন– অভিযাত্রা বীমাপত্র, সময় বীমাপত্র, মিশ্র বীমাপত্র ইত্যাদি।

২. অগ্নিবীমা (Fire Insurance) : অগ্নিকাণ্ডের বিপক্ষে কোনো মালপত্র, ঘর-বাড়ি বা অন্য কোনো বিষয়বস্তু বীমা করা হলে তাকে অগ্নিবীমা বলে। অনেক সময় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও মালপত্র পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। তাই, এ ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও মালপত্র কোনো বীমা কোম্পানির নিকট বীমা করে রাখে। এ ব্যবস্থায় বীমাকারী বীমাচুক্তির শর্তানুসারে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাগ্রহীতার ঘরবাড়ি, কল-কারখানা বা মালপত্র আগুন লেগে ভস্মীভূত হলে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে। তবে এর মধ্যে অবশ্যই চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকবে। তাছাড়া বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

অগ্নিবীমাপত্র সংগ্রহ

অগ্নিবীমাপত্র অগ্নিবীমা চুক্তি দলিল। নির্ধারিত প্রিমিয়াম পরিশোধ সাপেক্ষে বীমাকারী বীমার বিষয়বস্তু বীমাকৃত করে বীমাগ্রহীতাকে বীমা চুক্তির যে দলিল প্রদান করে তাকে অগ্নিবীমাপত্র বলে।

অগ্নিবীমাপত্র সংগ্রহের জন্য প্রস্তাবকারীকে নির্ধারিত প্রস্তাব ফরম পূরণ করে বীমা কোম্পানির নিকট দাখিল করতে হয়। এ ফরমে বীমা কোম্পানি প্রিমিয়ামের হার ও পরিমাণ উল্লেখ করে থাকে। প্রস্তাবকারী বীমাগ্রহীতা উল্লিখিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিষয়বস্তু বীমা করতে সম্মত থাকলে বীমা কোম্পানি বীমাপত্র প্রস্তুত করে তার নিকট প্রেরণ করে। সচরাচর পাঁচ প্রকার অগ্নিবীমাপত্র ইস্যু করা হয়, যেমন– একক বীমাপত্র, বিশেষ বীমাপত্র, গড় বীমাপত্র, ভ্যালুড বীমাপত্র এবং ভাসমান বীমাপত্র।

৩। জীবন বীমা : (Life Insurance) জীবন বীমা এরূপ এক প্রকার বীমা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জীবন বীমা করা হয়। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকার জন্য স্বামী, স্ত্রী, পুত্র বা কন্যার জীবন বীমা করা হয়। পরিবারের কর্তার জীবন বীমা করা থাকলে তার অকাল মৃত্যুতে তার মনোনীত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ বাবদ বীমা কোম্পানির নিকট থেকে সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা পায়। এর ফলে পরিবারটি ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। বীমাকৃত ব্যক্তির পলিসি চলাকালীন মৃত্যু না হলে সে পলিসির মেয়াদান্তে বোনাসসহ সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা বীমা কোম্পানির নিকট থেকে ফেরত পায়।

জীবন বীমার শর্তানুসারে বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ান্তে বীমাগ্রহীতাকে অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বীমাগ্রহীতার মৃত্যু ঘটলে তার মনোনীত ব্যক্তিকে বীমাকৃত টাকা পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমার বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে এবং বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতা উভয়ের মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস থাকতে হবে। নৌ-বীমা বা অগ্নিবীমার ন্যায় জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাকারীকে বীমাগ্রহীতার মৃত্যুতে অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে বীমাকৃত টাকা অবশ্যই ফেরত দিতে হবে।

জীবন বীমাপত্রের প্রকারভেদ

নিচে বিভিন্ন প্রকার জীবন বীমাপত্রের বর্ণনা দেয়া হল :

১। মেয়াদি বীমাপত্র (Endowment Policy) : অনেক সময় বীমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য তার জীবন বীমা করে বীমা কোম্পানির নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকার মেয়াদি বীমাপত্র সংগ্রহ করে। বীমাগ্রহীতা সমস্ত সময় ধরে বীমা কোম্পানিকে মাসিক, ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক অথবা বার্ষিক কিস্তিতে নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে থাকে। পলিসির মেয়াদান্তে বীমা কোম্পানি বীমাগ্রহীতাকে লাভসহ সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা পরিশোধ করে অথবা মেয়াদের পূর্বেই বীমাকৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে বীমা কোম্পানি উক্ত ব্যক্তির মনোনীত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বীমাকৃত টাকা পরিশোধ করে।

২। আজীবন বীমাপত্র (Whole Life Policy) : এই প্রকার জীবন বীমা পরিকল্পনায় বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পূর্বে বীমাকৃত টাকা পরিশোধ করা হয় না। একমাত্র বীমাগ্রহীতার মৃত্যুর পর বীমা কোম্পানি বীমাকৃত টাকা তার মনোনীত ব্যক্তিকে পরিশোধ করে।

৩। যৌথ জীবন বীমাপত্র (Joint Life Policy) : এই প্রকার জীবন বীমা পরিকল্পনায় একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তির জীবন বীমা করা হয়। বীমাগ্রহীতাদের কোনো একজনের মৃত্যু ঘটলেই অন্যান্য বীমাগ্রহীতারা বীমাকৃত টাকা পেয়ে থাকে।

৪। দুর্ঘটনা বীমা (Accident Insurance) : এ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি বা বস্তুর দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির বিপক্ষে বীমা করা হয়। এর শর্তানুসারে নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমা কোম্পানি বীমাগ্রহীতার বা তার কোনো বস্তুর দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। দুর্ঘটনার কারণে বিষয়বস্তুর ক্ষতি হলে বীমাকারী তা পূরণ করে দেয়। এটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি।

৫। শস্য বীমা : (Crop Insurance) বাংলাদেশের কৃষি মূলত প্রকৃতিনির্ভর। প্রকৃতির দয়ার ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এ দেশে শস্য ভাঙার। যে বছর আমাদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ সে বছর কানায় কানায় ভরে যায় আমাদের সোনার ফসলের গোলা। আবার যে বছর নির্দয় প্রকৃতি তার দয়ার হাত গুটিয়ে নেয় সে বছর আমাদের গোলা থাকে শূন্য। কৃষককুল ও আপামর জনগণ নিপতিত হয় চরম দুর্ভোগের মধ্যে। ঝড়, ঝঞ্ঝা, অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন, মহাপ্লাবন , অনাবৃষ্টি, ও মাঠ ঝল্সানো খরা, কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি কারণে ফসল হানি বা শস্য বিপর্যয় ঘটতে পারে। তাই কৃষিকাজে এরূপ অনিশ্চয়তার ঝুঁকি বিদ্যমান। এহেন অনিশ্চয়তাজনিত ঝুঁকির নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত শস্য বীমার উদ্ভব। আমাদের দেশেও তাই শস্য বীমার প্রচলন হয়েছে আস্তে আস্তে।

শস্যবীমা কৃষক বা ফসল উৎপাদনকারীকে ফসলের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে। এ ব্যবসায় বীমাগ্রহীতা কৃষক ও বীমাকারীর (বীমা কোম্পানি) মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যার বলে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারী বা বীমা কোম্পানি বীমাগ্রহীতার ফসল হানি বা উৎপাদনহ্রাসজনিত সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ

করে। অর্থাৎ বিশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা কোনো বিশেষ পরিস্থিতিজনিত কারণে বীমাগ্রহীতার ফসলহানি ঘটলে বা উৎপাদন হ্রাস পেলে বীমা কোম্পানি চুক্তির শর্ত মোতাবেক উক্ত ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু, ক্ষতি না হলে বীমা কোম্পানির আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। তাই, শস্যবীমাও নৌ–বীমা ও অগ্নিবীমার ন্যায় ক্ষতিপূরণের চুক্তি। এরূপ চুক্তির ক্ষেত্রেও বীমার বিষয়বস্তুতে বীমা গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

কৃষিপণ্যের চাহিদা হ্রাস বা মূল্যহ্রাসজনিত ক্ষতির ঝুঁকিও শস্যবীমার দ্বারা পূরণ করা বা মিটানো যায়। মূল্য উঠানামার অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে শস্যবীমা ব্যবস্থা কৃষক বা কৃষি পণ্যের উৎপাদনকারীদেরকে ঝুঁকিমুক্ত করে।

১০.৫ বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায় (Insurance Business in Bangladesh)

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অথচ, এ দেশে বীমার অবস্থা সন্তোষজনক নয়। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশ এলাকায় বীমা ব্যবসায়ের তেমন অগ্রগতি হয়নি। উপরন্ত, স্বাধীনতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানি বীমাকারীদের বিলুপ্তি ঘটে। এর ফলে এদেশে বীমা ব্যবসায়ে এক মহাশূন্যতা বিরাজ করে। এ অবস্থায় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার বীমা ব্যবসায়কে সম্পূর্ণরূপে জাতীয়করণ করে এবং ১৯৭৩ সালে জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশন নামের দু'টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। ১৯৮৫ সালের পূর্বাবধি এই দু'টি সংস্থাই এ দেশে একচেটিয়াভাবে বীমা কারবার করে। তাছাড়া, এখানে পোস্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স এর অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং ১৯৭৪ সাল থেকে আমেরিকান লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি এদেশে প্রাইভেট বীমা কোম্পানি হিসেবে ব্যবসায় চালিয়ে যায়।

সরকার বেসরকারি মালিকানায় বীমা ব্যবসায় গঠনের অনুমতি দিলে ১৯৮৫ সাল থেকে এ দেশে বেশ কতগুলো বীমা কোম্পানি গড়ে ওঠে। ১৯৮৮ সাল অবধি বাংলাদেশে বেসরকারি মালিকানায় মোট ১৮টি বীমা কোম্পানি নিবন্ধিত হয়। এরপর আরো কয়েকটি বীমা কোম্পানি এ দেশের বীমা ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করেছে। তথাপি, প্রয়োজনের তুলনায় এখানে বীমা কোম্পানির সংখ্যা অনেক কম।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বীমার গুরুত্ব অনুধাবন করেই সরকার বীমা ব্যবসায়ে বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করেছেন। বীমা ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ এ দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত হবে। সৃষ্টি হবে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ। বেকারত্ব হ্রাস পাবে। জনগণের আয় বাড়বে ও জীবনমান উন্নত হবে।

কিন্তু দারিদ্রতা, নিরক্ষরতা, দ্রব্যমূল্যের অসঙ্গতি, আয় ও সঞ্চয়ের অভাব, বীমা ব্যবসায়ে উদ্যোক্তার অভাব এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব, বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতিতে পর্বত প্রমাণ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। এর পরেও বলা যায়, এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে বীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এখানে বীমা ব্যবসায়ে যথেষ্ট বেসরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায়, সরকার ও জনগণের সহযোগিতায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশে বীমা ব্যবসায় অগ্রগতি লাভ করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কত সালে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন সৃষ্টি হয় ?

ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

২। কোন বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি ?

i. জীবন বীমা ii. নৌ-বীমা
iii. জীবন বীমা ব্যতিত সব বীমা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. ii খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. iii

[নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও]

জনাব আনোয়ার ১৯৯৫ সালে নিজের ও পরিবারের অপরাপর সদস্যদের নামে ১০ বছর মেয়াদি ৮১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের জন্য ফার ইস্ট লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। তিনি যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তাতে শর্ত ছিল যে, পরিবারের যেকোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে অন্য সদস্যরা ক্ষতিপূরণের অর্থ পাবেন।

৩। জনাব আনোয়ার যে বীমাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন তার নাম কী ?

ক. মেয়াদি বীমাপত্র খ. আজীবন বীমাপত্র
গ. যৌথ জীবন বীমাপত্র ঘ. স্বল্পকালীন জীবন বীমাপত্র

৪। ২০০৭ সালে জনাব আনোয়ারের মৃত্যু ঘটলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা ফার ইস্ট লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কত টাকা পাবেন ?

ক. দশ লক্ষ টাকা খ. চৌদ্দ লক্ষ টাকা
গ. বিশ লক্ষ টাকা ঘ. কোন টাকাই পাবেন না

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব মকবুল হোসেন একজন টেক্সটাইল শিল্পের মালিক। টিনসেডযুক্ত কারখানায় সুতা থেকে কাপড় তৈরি করা হয়। কারখানার পার্শ্ব দিয়ে একটি রাস্তা আছে, সেখান দিয়ে কলকারখানার শ্রমিকরা যাতায়াত করে থাকে। কারখানার এক দিকে মালামাল রাখার জন্য গোডাউনও রয়েছে। তার কোম্পানি, মালপত্র, সুতা, কাপড় ইত্যাদি যাতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কোনরূপ ধ্বংসস্তুপে পরিণত না হয় তার জন্য কর্ণফুলী ইন্সুরেন্স কোম্পানি লি:, টঙ্গী শাখায় বার্ষিক ৮২০,০০০ টাকা প্রিমিয়াম প্রদানের শর্তে ৫ বছরের জন্য একটি বীমা চুক্তি করে। তবে যদি কোনরূপ আগুন না লাগে তাহলে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ প্রদেয় অর্থ বীমা গ্রহীতা ফেরত পাবেন না।

ক. অগ্নিবীমা কাকে বলে ?
খ. এখানে বীমাযোগ্য কী স্বার্থ আছে ?
গ. অনুরূপ নতুন কোন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বীমা করার কী প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা উল্লেখ কর।
ঘ. শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে অগ্নিবীমা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– মূল্যায়ন কর।

একাদশ অধ্যায়

ব্যবসায় যোগাযোগ
Business Communication

১১.১ যোগাযোগ কাকে বলে (What is Communication)

যোগাযোগ হল বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ভাব বা তথ্যের আদান-প্রদান। মানব জীবনে ভাব বা তথ্যের আদান-প্রদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগের মধ্যেই জীবন অতিবাহিত করে। এটি মানব জীবনে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতই স্বাভাবিক।

যোগাযোগ শব্দটি অনেকভাবে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ যোগাযোগ বলতে চিঠিপত্র, প্রতিবেদন প্রভৃতিকে বুঝে। কেউবা যোগাযোগ বলতে শুধু সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমগুলোকে বুঝে থাকে, যেমন– টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স, ই-মেইল প্রভৃতি। আবার কেউবা দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অর্থ বা তথ্যের আদান-প্রদানকে যোগাযোগ বলে অভিহিত করেন। মূলত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে তথ্যাদি, ভাব, মতামত বা আবেগ ও অনুভূতি বিনিময়কে যোগাযোগ বলে। তথ্য ও ভাব বিনিময় মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। এটি আবার আকার, ইঙ্গিত, মুখমণ্ডলের ভাবভঙ্গি, চোখের ইশারা, স্পর্শ, শব্দ বা কাজের মাধ্যমেও হতে পারে। এক কথায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে চিন্তাধারা, ভাব, তথ্য ও মতামত বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ বলে।

১১.২ ব্যবসায়িক যোগাযোগ কী (What is Business Communication)

ব্যবসায়-সংগঠনের ভিতর ও বাইরে যে তথ্য, আদেশ, নির্দেশ প্রভৃতি আদান প্রদান হয়ে থাকে তাকে ব্যবসায়িক যোগাযোগ বলা হয়। ব্যবসায়িক যোগাযোগ অভ্যন্তরীণ হতে পারে আবার বাহ্যিকও হতে পারে। বিষয়বস্তকে দুভাবে ভাগ করা যায়, যা– অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যে তথ্য বা ভাবের আদান-প্রদান হয় তাকে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বলে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অবগত করানো হয়। কর্মকর্তা ও কর্মচারি ও উপরওয়ালা সহকর্মীদের সাথে তথ্য কিংবা ধারণা বিনিময় করতে পারে। বাহ্যিক যোগাযোগ সাধারণত অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, গ্রাহক, সরকার বা ব্যবসায় সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক যোগাযোগ মূলত লিখিত ও মৌখিক হতে পারে।

১১.৩ ব্যবসায় যোগাযোগের গুরুত্ব (Importance of Business Communication)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সফলতায় যোগযোগের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। নিচে ব্যবসায় যোগাযোগের গুরুত্ব উল্লেখ করা হল :

১। সংবাদ আদান-প্রদান : যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আদান-প্রদানে সাহায্য করে। এর ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সুষ্ঠুভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করতে পারে।

২। পরিকল্পনা প্রণয়ন : পরিকল্পনা হল ভবিষ্যতের কর্মপন্থার ছক নির্ধারণ। এ জন্য তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় প্রয়োজন। যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও সমন্বয় করা হয়।

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ : ব্যবসায়ীকে প্রতিনিয়ত নানাবিধ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য চাই সঠিক তথ্য। আর দক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগান দেয় সঠিক তথ্যের।

৪। ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা : যোগাযোগ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলকে একই লক্ষ্যে উজ্জীবিত করে। সঠিক যোগাযোগ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগ ও কর্মীকে আপন আপন কাজ করতে সহায়তা করে। এর ফলে ব্যবসায় সংগঠনের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

৫। শ্রমিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক : ব্যবসায়ের লক্ষ্য অর্জনে শ্রমিক ও মালিকের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অতীব প্রয়োজন। সুষ্ঠু যোগাযোগের অভাবে কর্মী ও মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং উত্তম যোগাযোগ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে।

৬। নির্দেশনা : যোগাযোগ নির্দেশনা দানের মাধ্যম। এর মাধ্যমে ব্যবসায় সংগঠনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অধঃস্তনদের নির্দেশনা দান করে।

৭। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় : ব্যবসায় যোগাযোগ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সৃষ্টি ও সংরক্ষণে সাহায্য করে। যোগাযোগ ব্যতীত আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের কথা চিন্তাও করা যায় না। এর মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়।

১১.৪ যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম (Various Communication Media)

নিম্নে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমগুলোর আলোচনা করা হল :

১১.৫ ব্যবসায়িক পত্র কাকে বলে (What is Business Letter)

অধুনা ব্যবসায় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যবসায়ের পরিধি দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ফলে ব্যবসায় কার্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ আবশ্যক। পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তথ্যের আদান-প্রদান, সম্পর্ক স্থাপন ও লেনদেনসহ ব্যবসায়িক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে।

সহজভাবে বলতে গেলে ব্যবসায় সংক্রান্ত লিখিত পত্রকে ব্যবসায়িক পত্র বলে। আরও একটু স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এটি মূলত ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদানকে বুঝায়। এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনের সূত্রপাত, সম্প্রসারণ ও নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। অধ্যাপক জে. এইচ. হেনসনের মতে, "ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কোনো বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে পারস্পরিকভাবে যে পত্র বিনিময় হয় তাকে ব্যবসায়িক পত্র বলে"।

অর্থাৎ ব্যবসায়িক পত্র–

ক) ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে লিখিত হয়।

খ) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আদান-প্রদান করা হয়।

গ) এর মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনের সূচনা, সম্প্রসারণ ও নিষ্পত্তিতে সাহায্য করে।

১১.৬ ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো (Format of a Business Letter)

ব্যবসায়িক পত্রের গঠন অন্যান্য পত্রের চেয়ে স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে থাকে। এরূপ পত্র রচনায় কতগুলো বিশেষ রীতি-নীতি মানতে হয়। রীতি-নীতি পত্রের বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় শৃঙ্খলা আনয়ন করে এবং পত্রকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই ব্যবসায়িক পত্র রচনায় সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরণ করতে হয়। পরের পৃষ্ঠায় ব্যবসায়িক পত্রের নমুনা, রূপ ও বিভিন্ন অংশগুলোর বর্ণনা দেয়া হল :

ব্যবসায়িক পত্রের কাঠামো বা বিভিন্ন অংশের নমুনা

১। শিরোনাম		মেসার্স রহমান এন্ড সন্স (কাপড় আমদানিকারক ও সরবরাহকারী) ২৫০, ইসলামপুর, ঢাকা। টেলিফোন : ৫০৮০৩২৪
২। তারিখ	২১ শে জুন ২০০৮	
৩। প্রাপকের ঠিকানা	মেসার্স হাবিব ব্রাদার্স চক বাজার বরিশাল	
৪। বিষয় শিরোনাম	বিষয় : বিভিন্ন প্রকার কাপড় ক্রয়ের প্রস্তাব।	
৫। সম্বোধন	জনাব/ প্রিয় জনাব/স্যার/মহাশয়/ভদ্র মহোদয়গণ	
৬। বিষয়বস্তু	....	
৭। বিদায় অভিবাদন		আপনার বিশ্বস্ত
৮। প্রেরকের স্বাক্ষর		.... এম রহমান
৯। সংযুক্তি	(১) বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের মূল্য তালিকা।	

১। শিরোনাম : ব্যবসায়িক পত্রের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ থাকে। এ অংশকে পত্রের শিরোনাম বলে। সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্যাডে উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাপানো থাকে।

২। তারিখ : ব্যবসায়ের পত্রে তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিরোনামের নিচে ডান পাশে বা বাম পাশে তারিখ দেয়া হয়।

৩। প্রাপকের ঠিকানা : পত্রের বাম পাশে তারিখের নিচে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লেখা হয়। কোন ব্যক্তির বাংলা নামের পূর্বে লিঙ্গ ভেদে জনাব/বেগম এবং ইংরেজি নামের আগে Mr. বা Ms. প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

৪। বিষয় শিরোনাম : বিষয় শিরোনাম পত্রের মূল বক্তব্যের সার সংক্ষেপে। এ অংশ দ্বারা প্রাপক এক নজরে পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা নিতে পারে।

৫। সম্বোধন : বিষয় শিরোনামের নিচে সম্বোধন বা অভিবাদনসূচক শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করা হয়। মূল বক্তব্য আরম্ভের প্রাক্কালে অভিবাদন জ্ঞাপন করা শিষ্টাচার। নানা প্রকার অভিবাদনের প্রচলন রয়েছে, যেমন– জনাব, মহাশয়, মহাত্মন, সুধী ইত্যাদি।

৬। মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু : বিষয়বস্তু বা মূল বক্তব্য পত্রের প্রাণস্বরূপ। বিষয়বস্তু সম্বোধনের নিচে বাম পাশে মার্জিন থেকে শুরু করতে হয়। পত্রের বিষয়বস্তুকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। প্রথম অংশে বিষয়বস্তুর সূচনা উপস্থাপন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় অংশে পত্রের মূল বক্তব্য বিষয় সহজ সরল ও সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়। তৃতীয় ও শেষ প্যারায় প্রেরক পত্রের মূল বক্তব্যের জের টানে এবং প্রাপক কী কী ব্যবস্থা নিতে পারে তার ইঙ্গিত প্রদান করে। অতঃপর ধন্যবাদান্তে পত্রটি শেষ করে।

৭। বিদায় অভিবাদন : মূল বক্তব্য লেখার পর বিদায় অভিবাদন লেখার নিয়ম রয়েছে। পত্রের বিদায় ভাষণ প্রারম্ভিক সম্বোধনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনার বিশ্বস্ত, বিনীত, আপনার অনুগত ইত্যাদি বিদায় অভিবাদনের উদাহরণ।

৮। প্রেরকের স্বাক্ষর : বিদায় অভিবাদনের নিচে পত্র লেখককে তার স্বাক্ষর প্রদান করতে হয়। পত্রের বৈধতার জন্য লেখকের স্বাক্ষর অত্যাবশ্যক। স্বাক্ষরবিহীন পত্রের কোন মূল্য দেয়া হয় না এবং এর আইনগত বৈধতা নেই।

৯। সংযুক্তি : ব্যবসায়িক পত্রের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত কোন প্রকার প্রামাণ্য দলিল সংযোজন করা হলে তা সংযুক্তি হিসাবে পত্রের সর্বনিম্নে উল্লেখ করা হয়।

১১.৭ ব্যবসায়িক পত্রের প্রকারভেদ (Types of Business Letter)

লেনদেনের ধরন, বিষয়বস্তু, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে ব্যবসায় পত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিচে কয়েকটি ব্যবসায় পত্রের নাম উল্লেখ করা হল :

১। চাকরির আবেদন, সাক্ষাৎকার, নিয়োগ ও যোগাযোগপত্র।
২। সুপারিশ ও পরিচয়পত্র।
৩। প্রচারপত্র।
৪। তথ্যানুসন্ধান পত্র।
৫। যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র।
৬। বিক্রয় প্রস্তাব, দর উল্লেখ ও ফরমায়েশ পত্র।
৭। অভিযোগ, দাবি ও মীমাংসা পত্র।
৮। তাগাদা ও পাওনা আদায় পত্র।
৯। আমদানি ও রপ্তানিবিষয়ক পত্র।
১০। ব্যাংকিং ও বীমা পত্র।

১১.৮ ডাক যোগাযোগ (Postal Communication)

মানব সভ্যতার এক বিশেষ অবদান হচ্ছে ডাক ব্যবস্থা। প্রতিটি দেশেই ডাক ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে ডাক বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এর শাখা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বস্তুত বাংলাদেশ ডাক বিভাগ তার প্রায় ৮০০০ পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের অবিরাম সেবা করে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার রাজধানীর সাথে

সকল জেলা সদর এবং জেলা সদরের সাথে সকল থানা সদরে ডাক যোগাযোগ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা নিয়েছেন। এ জন্য ঢাকা থেকে সকল জেলা সদর ও জেলা সদর থেকে থানা সদরে সরাসরি মেইল ব্যাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে নূন্যতম সময়ে ডাক আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডাক যোগাযোগের কাজ

কাছের অথবা দূরের একের সঙ্গে অপরের চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা এবং মানি অর্ডারের মাধ্যমে প্রেরকের অর্থ প্রাপকের ঠিকানায় বিলি করা ডাক বিভাগের প্রধান ও চিরাচরিত কাজ। এ দুটো কাজ ছাড়া আরো যে সকল জনসেবামূলক কাজ ডাক বিভাগ নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে–

১। পার্সেল, প্যাকেট ও বীমাকৃত দ্রব্যাদির আদান-প্রদান।

২। পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক পরিচালনা ও সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রির মাধ্যমে জনগণকে বিশেষত গ্রামের সাধারণ মানুষদের সঞ্চয়ী হতে উদ্বুদ্ধ করা।

৩। ডাক জীবন বীমার মাধ্যমে জনগণের সেবা করা।

৪। প্রাইজবণ্ড বিক্রি ও ভাঙানো।

৫। বেতার লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন করা।

৬। মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান ও মোটর ভেহিক্যাল ট্যাক্স আদায় করা।

৭। আয়কর ফরম বিক্রি করা প্রভৃতি।

ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্র, পার্সেল, টাকা-পয়সা অতি সহজে ও সুলভে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পোস্ট অফিস মারফত পাঠানো যায়। এজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ডাকঘরের নিয়মাবলি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখা বাঞ্ছনীয়।

১১.৯ চিঠি (Letter)

ডাক মারফত প্রেরিত চিঠি প্রধানত তিন প্রকারের হয়ে থাকে যথা– সাধারণ, নিবন্ধিত ও বীমাকৃত। নিচে এগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা হল :

সাধারণ চিঠি

চিঠি পোস্ট কার্ডে লেখা যায়, আবার বিভিন্ন কাগজে লিখে খামের ভিতর পুরেও পাঠানো যায়। আমাদের দেশে একখানা পোস্ট কার্ডের দাম ৳ ১.৫০ টাকা, আর একখানা খামের দাম ৳ ৩.০০ টাকা। কেউ ইচ্ছা করলে নিজের পছন্দমত খামে চিঠি পাঠাতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে ৳ ৩.০০ টাকা দামের ডাক টিকিট খামের উপর লাগিয়ে দিতে হয়। যদি চিঠির ওজন ১০ গ্রামের বেশি হয় তা হলে প্রতি ১০ গ্রাম বা তার ভগ্নাংশের জন্যে ৳ ৩.০০ টাকা হারে ডাক টিকিট লাগাতে হবে। পোস্ট কার্ড ও খাম ছাড়া এরোগ্রামেও চিঠি লেখা যায়। এ এরোগ্রাম অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক হতে পারে। একখানা অভ্যন্তরীণ এরোগ্রামের দাম ৩.০০ টাকা। এতে ভিন্ন কাগজের প্রয়োজন হয় না। এরোগ্রামে প্রয়োজনীয় ডাক মাসুলসহ লেখার কাগজ থাকে।

চিঠি বিনা টিকিট বা কম মূল্যের টিকিট লাগিয়ে ডাকে পাঠাতে হলে প্রাপকের নিকট থেকে ঘাটতি টাকার দ্বিগুণ টাকা আদায় করা হয়।

নিবন্ধিত বা রেজিস্ট্রার্ড চিঠি (Registered)

চিঠি নিবন্ধিত ডাকে পাঠানো যায়। এ রকম চিঠির প্রাপক ও প্রেরকের নাম ডাকঘরের পাতায় লিপিবন্ধ করা হয় বলে একে নিবন্ধিত বা রেজিস্ট্রার্ড পত্র বলে। চিঠি যাতে নিশ্চিতভাবে প্রাপকের হাতে পৌঁছে সে জন্যে তা রেজিস্ট্রি করা

হয়। চিঠি রেজিস্ট্রি করতে নিয়মিত মাসুল ছাড়াও অতিরিক্ত ৳ ৪.০০ টাকার ডাক টিকিট দিতে হয় এবং চিঠির উপর 'নিবন্ধিত' এই কথাটি লিখে দিতে হয়। এরূপ পত্রের প্রাপক ও প্রেরক উভয়েরই নাম ও ঠিকানা চিঠির উপর লিখতে হয়। নিবন্ধিত পত্রের acknowledgement ব্যবস্থা আছে। প্রাপ্তি স্বীকারের মাধ্যমে প্রাপক চিঠি পেল কিনা সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায়। রেজিস্ট্রিকৃত পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারের জন্যে আরও ৳ ৪.০০ টাকার টিকিট চিঠির উপর লাগাতে হয়।

প্রাপকের নিকট থেকে রেজিস্ট্রার্ড চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারপত্র পেতে হলে পোস্ট অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত একখানি 'প্রাপ্তি স্বীকার' ফরম পূরণ করে তা চিঠির সাথে সংযুক্ত করে দিতে হয়। চিঠি ডেলিভারি নেয়ার সময় প্রাপককে 'একনলেজমেন্টের' নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর করে তা ডাক পিয়নকে ফেরত দিতে হয়। অতঃপর প্রেরকের কাছে পোস্ট অফিস মারফত উক্ত একনলেজমেন্ট আবার ফেরত আসে। এ রসিদ পেলে চিঠি নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌছেছে বলে নিশ্চিত হতে পারে।

চিঠি যে ডাকঘর হতে নিবন্ধন করা হয়; সেখান হতে প্রাপকের নাম ও ঠিকানাসহ একটি নম্বরযুক্ত রসিদ পাওয়া যায়। এ রসিদে উক্ত ডাকঘরের সিলমোহর থাকে। যদি রেজিস্ট্রার্ড চিঠি কোন প্রকারে হারিয়ে যায় অথবা প্রাপকের নিকট না পৌছে কিংবা প্রেরকের নিকট ফেরত না আসে তবে উক্ত রসিদ বলে পোস্ট অফিসে তা অনুসন্ধান করা যায় এবং চিঠি যদি একেবারে না পাওয়া যায়, তাহলে পোস্ট অফিস থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়।

বীমাকৃত পত্র (Insured Letter)

চিঠির অধিকতর নিরাপত্তার জন্য এটি রেজিস্ট্রি করার পর আবার বীমাকৃত করা যায়। চিঠি বীমাকৃত করতে হলে খামের উপর অংকে ও কথায় স্পষ্ট করে কত টাকার জন্য বীমাকৃত হবে তা লিখে দিতে হয়। ব্যবসায় সংক্রান্ত মূল্যবান কাগজপত্র ও দলিল বা ড্রাফট ইত্যাদি ডাকে পাঠাতে হলে সেগুলো বীমাকৃত পার্সেলে পাঠানো অধিক নিরাপদ। এভাবে চিঠি পাঁচ হাজার টাকা মূল্য পর্যন্ত বীমাকৃত করা যায়।

পাঁচশত টাকা মূল্য পর্যন্ত বীমা করতে হলে চিঠি রেজিস্ট্রি করার মাসুল ছাড়া আরও ৳ ১০.০০ টাকা লাগে। এর অধিক প্রতি ৳ ১০০ টাকা বা তার ভগ্নাংশের জন্য (৳ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত) ৳ ২.০০ টাকা হারে ডাকমাসুল দিতে হয়। চিঠি বীমাকৃত করা হলে ডাকঘর থেকে যে রসিদ দেয়া হয় তাতে বীমাকৃত টাকার পরিমাণ উল্লেখ থাকে। রেজিস্ট্রার্ড চিঠির মতই বীমাকৃত চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার পত্র পাওয়া যায়।

১১.১০ টেলিগ্রাম বা তারবার্তা (Telegram)

তারযোগে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। ব্যবসায় সংক্রান্ত বা অন্য কোনো বার্তা দ্রুত প্রেরণ করতে হলে তারবার্তা পাঠাতে হয়। তারবার্তা পত্রের চেয়ে অধিক কার্যকর।

তারবার্তায় প্রধান তিনটি অংশ রয়েছে। যথা– ক. প্রাপকের পূর্ণনাম ও ঠিকানা খ. মূল বক্তব্য এবং গ. প্রেরকের নাম। তারবার্তার এ সকল অংশের প্রতিটি শব্দের জন্য মাসুল দিতে হয়। তারবার্তার ফরমের বিপরীত পৃষ্ঠায় প্রেরকের পূর্ণনাম ও ঠিকানা লিখতে হয় যার জন্য কোনো মাসুল দিতে হয় না।

তারবার্তায় স্পষ্টভাবে প্রাপকের নাম ও ঠিকানা লিখতে হয়। নামের পূর্বে ও পরে কোনো রকম সৌজন্যমূলক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। এতে খরচ বেড়ে যায়।

তারবার্তায় মূল অংশ সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট হতে হবে। তারবার্তায় কমা, দাঁড়ি, সেমিকোলন, হাইফেন ইত্যাদিকে এক একটি শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। এজন্য মূল বক্তব্য লেখার সময় এসবের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। টেলিগ্রাম বার্তা রচনায় বোধগম্যতার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। এর ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতার ওপর জোর দেয়া হয় না। প্রাপক বার্তার অর্থ বুঝতে পারলেই চলে।

বার্তা প্রেরকের সংক্ষিপ্ত অথচ পরিচিত নামটি ব্যবহার করা উচিত। এখানে পূর্ণনাম লেখার প্রয়োজন নেই। কেননা পূর্ণ নাম লিখলে তারবার্তার ব্যয় বেড়ে যাবে। শব্দের সংখ্যা অনুযায়ী তারবার্তার মাসুল ধার্য করা হয়।

তারবার্তা দুই প্রকারের হতে পারে, যথা- (ক) সাধারণ ও (খ) জরুরি। যদি সংবাদটি দ্রুত বা জরুরিভিত্তিতে পাঠানোর প্রয়োজন হয় তাহলে সাধারণ তারবার্তার চেয়ে বেশি মাসুল দিতে হয়।

জরুরি বার্তা প্রেরণ করতে হলে ফরমের উপর জরুরি কথাটি লিখে দিতে হয়। উল্লিখিত সকল ডাকমাসুল পরিবর্তনযোগ্য।

১১.১১ টেলেক্স (Telex)

টেলেক্স একটি দ্রুততম যোগাযোগ মাধ্যম। এ যন্ত্রের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরক ব্যবসায় সংক্রান্ত বা অন্য কোনো সংবাদ সরাসরি মুদ্রিত করে সংবাদ প্রাপকের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে পৌছাতে পারে। প্রেরক এ যন্ত্রে যা মুদ্রিত করবে হুবহু সে মুদ্রিত লেখা একই সময়ে প্রাপকের অপর যন্ত্রে হবে। এ যন্ত্রের সংবাদ সংক্ষেপ করার জন্য সংকেত ব্যবহার করা হয় যার জন্য বড় সংবাদকে ছোট আকারে পাঠানো সম্ভব। যেমন, টেলেক্স-এর ভাষায় We-এর সংক্ষিপ্তরূপ W এবং You এর সংক্ষিপ্তরূপ U। এ যন্ত্রের সাফল্য হচ্ছে প্রেরিত তথ্য প্রাপকের নিকট পৌঁছেছে কিনা তা নিশ্চিভাবে বোঝা যায়।

১১.১২ ফ্যাক্স (Fax)

বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বার্তা প্রেরণের একটি ইলেকট্রনিক্স মাধ্যম হচ্ছে ফ্যাক্স। ফ্যাক্স-এর পুরো কথাটি হলো Faximile। ফ্যাক্স যন্ত্রের সাহায্যে দলিল চিঠিপত্র অবিকল অনত্র প্রেরণ করা যার। এই যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, এর এক প্রান্তে অবস্থিত সিলিন্ডারের গায়ে প্রেরিতব্য বস্তুটির ইমেজ (মূর্তি) জড়িয়ে দিলে অপর প্রান্তে আপনা-আপনি সে ইমেজের ফটোগ্রাফ উঠে যায়। প্রতিষ্ঠানসমূহ এ যন্ত্রের মাধ্যমে চিত্র, ফর্মূলা, সংবাদ প্রভৃতি হুবহু দূরের কোন স্থানে দ্রুত পাঠাতে পারে।

১১.১৩ টেলিফোন (Telephone)

টেলিফোন কাছের ও দূরের কারো সঙ্গে কথা বলার এক প্রকার যন্ত্র। এ যন্ত্র দূরত্বকে অতি নিকটে আনয়ন করেছে। ব্যবসায়ীরা টেলিফোনের সাহায্যে দেশ-বিদেশের লোকদের সাথে আলাপ করে ব্যবসায়িক কার্য সম্পাদন করতে পারে। আধুনিক অফিসে এর ব্যবহার অপরিহার্য। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো পি. বি. এক্স বা পি. এ. বি. এক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের গ্রাহকবৃন্দের পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশব্যাপী সরাসরি ডায়ালিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সরাসরি টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক সাবসক্রাইবারস্ ডায়ালিং (আই. এস. ডি.) টেলিফোন গ্রাহক নিজে ডায়াল ঘুরিয়েই (অপারেটরের সাহায্য ছাড়া) বিশ্বের সব কয়টি দেশের সাথে টেলিফোনে সরাসরি কথা বলতে পারে।

১১.১৪ ই-মেইল (E-mail)

ই-মেইলের পুরোকথা হলো ইলেকট্রনিক মেইল (Electronic mail), ই-মেইল শুধু কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবহার করা হয়। ই-মেইল ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত একটি মডেম (Modem) যন্ত্রের মাধ্যমে ইন্টারনেট যুক্ত হয়ে প্রাপকের ই-মেইল ঠিকানায় যে কোনো তথ্য বা লেখা টাইপ করে পাঠানো যায়। ই-মেইলের জন্য প্রাপক ও প্রেরকের বিশেষ ধরনের ঠিকানা ব্যবহার করতে হয়। যেমন−(drmaner@bttb. net)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **তারবার্তার প্রধান কয়টি অংশ ?**

ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২। **ডাক যোগাযোগের উল্লেখযোগ্য কাজ হল–**

i. চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা
ii. প্রাইজ বন্ড বিক্রি ও ভাঙানো
iii. জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা

কোনটি অর্থনীতিতে বেশি অবদান রাখে ?

ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. iii

৩। **যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাৎক্ষণিক ছবি পাঠানো যায় –**

i. টেলেক্স এর মাধ্যমে ii. তারবার্তার মাধ্যমে
iii. ফ্যাক্সের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. iii

৪। নাটোরের লালপুর গ্রাম থেকে ঢাকায় কর্মরত আফসানার নিকট তার মা পৃথক ২টি খামে ডাকটিকিট না লাগিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। ডাকপিয়ন পত্র প্রদান করার সময় পত্র গ্রহণকারীর নিকট থেকে কত টাকা আদায় করবেন ?

ক. ৮ ২ টাকা খ. ৮ ৪ টাকা
গ. ৮ ৬ টাকা ঘ. ৮ ৮ টাকা।

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব সুমন আহমেদ চৈতী বায়িং হাউজের একজন মার্চেন্ডাইজার। তার কাজ হল বিদেশি ক্রেতাদের সাথে যোগাযোগ করে তার নিজ কোম্পানির পোষাকসহ অন্যান্য মালামাল সম্পর্কে (মূল্য, মান ইত্যাদি) ধারণা দেয়া এবং কোম্পানির একজন গ্রাহক তৈরি করা। অর্ডার গ্রহণ, অর্ডার প্রদান এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের আদান-প্রদান করার জন্য জনাব সুমন টেলেক্স, ফ্যাক্স, টেলিফোন, মোবাইল ও সর্বশেষ প্রযুক্তি ই-মেইল ব্যবহার করেন। জনাব সুমন আহমেদ এর বেশিরভাগ ক্রেতাই ইউরোপসহ আমেরিকার। ব্যবসায় সম্প্রসারণ, চাহিদা অনুযায়ী পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ, ব্যবসায়ে সফলতা অর্জনের জন্য আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমই জনাব সুমনের কোম্পানি ব্যবহার করে থাকে।

ক. ব্যবসায়িক যোগাযোগ কী ?
খ. ব্যবসায়িক যোগাযোগের ২টি গুরুত্ব বর্ণনা কর।
গ. আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে যোগাযোগের কোন মাধ্যম তুমি গ্রহণ করবে ? কেন ?
ঘ. আধুনিক ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ডাক যোগাযোগের চেয়ে ই-মেইল বেশি কার্যকরী মাধ্যম। তুমি কি একমত ? যুক্তি দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

তথ্যানুসন্ধান পত্র
Letter of Enquiry

১২.১ তথ্যানুসন্ধান পত্র কী (What is Letter of Enquiry)

যে পত্রের মাধ্যমে ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত তথ্য অনুসন্ধান করা হয় তাকে তথ্যানুসন্ধান পত্র বলে। প্রসঙ্গত নিয়োগকর্তা প্রায়শই কর্মখালির সংবাদ দিয়ে সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করে। বিজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রার্থীরা আবেদনপত্র পেশ করে। নিয়োগদানের পূর্বে নিয়োগকর্তা মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানার প্রয়োজন বোধ করে। সুতরাং নিয়োগকর্তা প্রার্থীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও চারিত্রিক গুণাবলি জানতে চেয়ে প্রার্থী প্রদত্ত পরিচয় সূত্রে অথবা প্রার্থীর পরিচিত কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট যে পত্র লেখে তাকে তথ্যানুসন্ধান বা যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র বলে। এর মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যাদি অনুসন্ধান করা হয়।

আবার ব্যবসায় জগতেও তথ্যানুসন্ধান পত্রের প্রচলন রয়েছে। বিক্রেতা বা মাল সরবরাহকারী অনেক সময় নতুন বা অপরিচিত ক্রেতার নিকট থেকে মালের অর্ডার পায়। মাল পাঠাবার আগে সে ফরমায়েশদাতার আর্থিক অবস্থা, সুনাম, সততা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নিয়ে প্রেরিতব্য মালের মূল্য আদায়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চায়। সুতরাং ফরমায়েশদাতার আর্থিক অবস্থা, সুনাম, সততা ইত্যাদি জানতে চেয়ে বিক্রেতা ফরমায়েশদাতার পরিচিত কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট যে পত্র লেখে তাকে ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধান পত্র বলে।

১২.২ তথ্যানুসন্ধান পত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of the Letter of Enquiry)

তথ্যানুসন্ধান বা যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র দুই প্রকার, যথা–

ক. ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান এবং খ. ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধান। আমরা উভয় প্রকার পত্রের তত্ত্বমূলক ও ব্যবহারিক দিক পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করব।

১২.২.১ ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান বা অনুসন্ধান পত্র কী (What is Personal Letter of Enquiry)

ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাকরির জন্য আবেদনকারীকে নিয়োগদানের পূর্বে নিয়োগকর্তা আবেদনকারীর যোগ্যতা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলি জানতে চেয়ে আবেদনকারীর পরিচিত কোনো তৃতীয় পক্ষের নিকট যে পত্র লেখে তাকে ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র বলে। আবেদনকারী অনেক সময় তার আবেদনপত্রে পরিচয়সূত্রের উল্লেখ করে থাকে। নিয়োগকর্তা তদানুসারে পত্র প্রেরণ করে আবেদনকারীর যোগ্যতা অনুসন্ধান করে। নিয়োগকর্তাকে এতে পত্র লেখার কারণ, প্রার্থীর যোগ্যতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি, প্রদত্ত সংবাদ গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যতে অনুরূপ সেবাদানের আশ্বাস প্রভৃতি উল্লেখ করতে হয়। মোটকথা যে পত্রে ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান করা হয় তাকে ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান পত্র বলে।

১২.২.২ ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান পত্রের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অনুসন্ধানকারীকে ব্যবসায় পত্রের কাঠামো অনুসরণ করে অনুসন্ধান পত্র লিখতে হয়। এতে পত্রের শিরোনাম, অভ্যন্তরীণ ঠিকানা, সম্বোধন, বিষয়বস্তু, বিদায় অভিনন্দন, স্বাক্ষর প্রভৃতি বিষয় প্রথা অনুযায়ী লিপিবন্ধ করতে হবে।

১। অনুসন্ধান পত্র রচনাকালে পত্র লেখককে আবেদনকারীর পূর্ণ পরিচয় প্রদানের কথা স্মরণ রাখতে হবে। তাছাড়া, প্রার্থীর কোন্ কোন্ তথ্য অনুসন্ধানকারী জানতে ইচ্ছুক তাও তাকে পত্রে উল্লেখ করতে হবে।

২। অনুসন্ধানকারী পত্র প্রাপকের কাছ থেকে নিরপেক্ষ উত্তর পাবার আশাবাদ ব্যক্ত করে অনুসন্ধান পত্র লিখবে।

৩। অনুসন্ধান পত্রে প্রাপকের প্রদত্ত সংবাদ গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার কথা অনুসন্ধানকারীকে স্মরণ রাখতে হবে।

৪। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে অনুসন্ধানকারী তার পত্রে পত্র প্রাপকের অনুরূপ সেবাদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে।

৫। অনুসন্ধান পত্রের ভাষা হবে স্পষ্ট, সহজ সরল। এতে দ্ব্যর্থবোধক ভাব বা ভাষার সন্নিবেশ ঘটবে না।

৬। অনুসন্ধান পত্র অবশ্যই সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে।

৭। অনুসন্ধান পত্রে অনুসন্ধানকারীর সৌজন্য ও বিনয় প্রকাশ করতে হবে।

৮। অনুসন্ধানকারী পত্র প্রাপকের সেবার জন্য তার পত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

১২.২.৩ ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের উত্তর পদ্ধতি

অনুসন্ধান পত্র পাওয়ার পর পত্র প্রাপক অনুসন্ধানকারীকে তার উত্তর প্রদান করে থাকে। অনুসন্ধান পত্রের উত্তর- ১. অনুকূল ২. প্রতিকূল অথবা ৩. নিরপেক্ষ হতে পারে।
নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হল :

ক. ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসন্ধানের অনুকূল উত্তরপত্র

যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের উত্তরে উত্তরদাতা জিজ্ঞাসিত আবেদনকারীর অনুকূলে তথ্যাদি পরিবেশন করে যে পত্র লিখে তাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসন্ধানের অনুকূলে উত্তরপত্র বলে। এতে আবেদনকারীর যোগ্যতা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা, মনোবল প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করা হয়।

সুপারিশ পত্রে নিচে বর্ণিত বিষয়গুলোর বর্ণনা থাকা বাঞ্ছনীয়।

১) এতে পত্র অনুসন্ধান পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করবে।
২) সুপারিশ পত্রে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও পূর্ণ পরিচয় তুলে ধরতে হবে।
৩) এতে উত্তরদাতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলির বর্ণনা দেবে।
৪) এতে আবেদনকারীকে নিয়োগদানের সুপারিশ থাকবে। তবে উত্তরদাতা তার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা ব্যক্ত করবে।
৫) পরিশেষে সুপারিশকৃত ব্যক্তির উন্নতি কামনা করে উত্তরদাতা ব্যক্তিগত সুপারিশপত্র শেষ করবে।
এরপর বিদায় অভিনন্দনসূচক শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করে উত্তরদাতা এতে তার স্বাক্ষর প্রদান করবে।

খ. ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের প্রতিকূল উত্তর

প্রয়োজনবোধে অনুসন্ধান পএের উত্তরদাতা জিজ্ঞাসিত আবেদনকারীর যোগ্যতা, দক্ষতা বা চারিত্রিক গুণাবলির বিপক্ষে বিবৃতি দিয়ে যে পত্র লেখে তাকে যোগ্যতা অনুসন্ধানের প্রতিকূল উত্তর বলে। নেক সময় আবার উত্তরদাতা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বা বিপক্ষে না বলে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে। যাহোক, যোগ্যতা অনুসন্ধানের প্রতিকূল উত্তর রচনা বড়ই জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ। **এ প্রকার পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হওয়া উচিত :**

১) অনুসন্ধান পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার।
২) জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির পরিচয় বর্ণনা।

৩) উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কিছু বলার নেই বলে দুঃখ প্রকাশ।

৪) উক্ত ব্যক্তির অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও চারিত্রিক দুর্বলতার বিবরণ।

৫) তারপর অনুসন্ধানকারী তাকে নিয়োগ করলে পত্র লেখকের কোন আপত্তি বা কোন দায়িত্ব থাকবে না বলে অভিমত প্রকাশ।

৬) পত্রের বিষয়বস্তু গোপন রাখার অনুরোধ জ্ঞাপন ইত্যাদি।

কয়েকটি নমুনা পত্র

১। হিসাবরক্ষক পদের আবেদনকারীর যোগ্যতা অনুসন্ধান।

হক ব্রাদার্স এন্ড কোং

(সাবান প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী)

ফোন : ৪১২১

১৯৩/বি, সাতমাথা রোড
বগুড়া
২৩ শে জুলাই, ২০০৮

মিঃ মশিউর রহমান
ম্যানেজার
মেসার্স হামিদ এন্টারপ্রাইজ
৪২, গ্রেটার রোড, রাজশাহী

জনাব,

আপনার প্রতিষ্ঠানের সহকারী হিসাবরক্ষক জনাব রুহুল আমিন আমাদের ফার্মের হিসাবরক্ষক পদের জন্য আবেদন করেছেন এবং পরিচয়সূত্র হিসাবে আপনার নাম উল্লেখ করেছেন।

জনাব রুহুল আমিন কতদিন ধরে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে এবং কী কারণেই বা তিনি আপনাদের ফার্ম ছেড়ে যেতে চাচ্ছেন তা আমাদের জানিয়ে অনুগৃহীত করবেন। অনুগ্রহ করে তাঁর কর্মদক্ষতা, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন্যান্য চারিচিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা দেবেন।

আপনার সুবিধার্থে এ পত্রের সাথে আমাদের ঠিকানা সংবলিত একটি ডাক টিকিটযুক্ত খাম প্রেরণ করলাম। আপনার প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। ভবিষ্যতে আমরা আপনাদের খেদমতে অনুরূপ সেবা প্রদানের সুযোগ পেলে ধন্য হব। ধন্যবাদ।

নিবেদক
আজগর আলী আকন্দ
ম্যানেজিং পার্টনার

২। উপরিউক্ত পত্রের অনুকূল উত্তর : সুপারিশপত্র

হামিদ এন্টারপ্রাইজ

(মনিহারি দ্রব্যাদির বিক্রেতা ও সরবরাহকারী)

৪২, গ্রেটার রোড
রাজশাহী
১লা আগস্ট, ২০০৮

মিঃ আজগর আলী আকন্দ
ম্যানেজিং পার্টনার
হক ব্রাদার্স এন্ড কোং
১৯৩/বি, সাতমাথা রোড
বগুড়া

জনাব,

আপনার ২৩শে জুলাই, ২০০৮ তারিখের পত্রখানি পেলাম।

জনাব রুহুল আমিন বিগত দু'বছর ধরে আমাদের ফার্মে হিসাবরক্ষক পদে কর্মরত আছেন। কাজে যোগদান করা অবধি তিনি পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করে আসছেন। এ পর্যন্ত আমরা তার চরিত্রের কোনরূপ দোষত্রুটি লক্ষ করিনি। নিঃসন্দেহে তিনি একজন নিষ্ঠাবান, বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী ও দক্ষ কর্মী। সীমিত সুযোগ সুবিধার কারণে আমরা তাঁকে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত পদে নিয়োগ করতে পারছি না। এ কারণেই তিনি অন্যত্র চাকরির সন্ধান করেছেন।

আমরা আনন্দের সঙ্গে তাঁকে যে কোনো দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করছি। আমরা সর্বদাই জনাব আমিনের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. রহমান
ম্যানেজার

৩। যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের (১নং পত্রের) প্রতিকূল উত্তর।

হামিদ এন্টারপ্রাইজ

(মনিহারি দ্রব্যাদি বিক্রেতা ও সরবরাহকারী)

৪২, গ্রেটার রোড
রাজশাহী
১লা আগস্ট, ২০০৮

মিঃ আজগর আলী আকন্দ
ম্যানেজিং পার্টনার
হক ব্রাদার্স এন্ড কোং
১৯৩/বি, সাতমাথা রোড
বগুড়া

জনাব,

আপনার ২৩ শে জুলাই, ২০০৮ তারিখের পত্রখানি পেলাম।

জনাব রুহুল আমিন বিগত দু'বছর ধরে আমাদের ফার্মে সহকারী হিসাবরক্ষক পদে কর্মরত আছেন। কিন্তু, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর অনুকূলে বলার মত আমাদের কিছু নেই। নানারূপ দোষত্রুটি ও অযোগ্যতার কারণে বাধ্য হয়ে ইতোমধ্যে আমরা তাঁকে কেন চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে না, এই মর্মে ১৫ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করেছি।

জনাব আমিনকে হর-হামেশাই কর্তব্য পালনে গাফেলতি করতে দেখা গেছে। এমনকি, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখাও দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তাঁর চালচলন ও শৃঙ্খলাবোধও সন্তোষজনক নয়। এমতাবস্থায় আপনারা তাঁকে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ করবেন কিনা তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। তবে এ ব্যাপারে আমরা কোন দায়িত্ব নিতে অপরাগ।

অনুগ্রহপূর্বক পত্রের বিষয়বস্তু গোপন রাখবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. রহমান
ম্যানেজার

৪। ক্যাশিয়ার পদে আবেদনকারীর যোগ্যতা অনুসন্ধান।

রয়্যাল স্টোরস্

(স্টেশনারি দ্রব্যাদির সরবরাহকারী)

১৪৫, মৌলভী বাজার
ঢাকা
২রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮

ম্যানেজিং পার্টনার
মেসার্স রহমান এন্ড কোং
৫ নং স্টেশন রোড
দিনাজপুর

জনাব,

আপনাদের প্রতিষ্ঠানের অফিস সহকারী জনাব আহমদ হোসেন প্রামাণিক আমাদের ফার্মে ক্যাশিয়ার পদের জন্য আবেদন করেছেন। তিনি পরিচয়সূত্র হিসেবে আপনার নাম উল্লেখ করেছেন।

জনাব প্রামাণিক কতদিন যাবৎ আপনাদের ফার্মে নিয়োজিত আছেন এবং কী কারণে তিনি আপনাদের ফার্ম ছেড়ে অন্যত্র চাকরির খোঁজ করেছেন তা আমাদের জানিয়ে উপকৃত করবেন। অনুগ্রহপূর্বক তাঁর যোগ্যতা, দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা জানেন তাও আমাদের জানাবেন।

আপনাদের সুবিধার্থে এ পত্রের সঙ্গে আমাদের ঠিকানা সংবলিত ও ডাক টিকিটযুক্ত একটি খাম প্রেরণ করলাম। আমরা এ মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করছি যে, আপনাদের প্রদত্ত যে কোনো তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে অনুরূপ সেবাদানের সুযোগ পেলে কৃতার্থ হব।

আপনার বিশ্বস্ত
এন. এন. বিশ্বাস
জেনারেল ম্যানেজার

৫। উপরোক্ত পত্রের (৪ নং পত্রের) অনুকূল উত্তর বা সুপারিশপত্র।

রহমান এন্ড কোং

(স্টেশনারি দ্রব্যাদির খুচরা বিক্রেতা)

৫নং স্টেশন, রোড
দিনাজপুর
১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮

জেনারেল ম্যানেজার
রয়াল স্টোর্স
১৪৫, মৌলভী বাজার
ঢাকা

জনাব,

আপনার ২ রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের পত্রখানি যথাসময়ে আমাদের হস্তগত হয়েছে।

আপনার পত্রে আপনি আমাদের ফার্মের অফিস সহকারী জনাব আহমদ হোসেন প্রামাণিক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। জনাব প্রমাণিক আমাদের ফার্মে বিগত ৪ বছর ধরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অফিস সহকারী হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। তিনি একজন সৎ, কর্মঠ, সুদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারি। এ যাবৎ আমরা তাঁর চরিত্রে কোনরূপ দোষ ত্রুটি লক্ষ করিনি।

সীমিত সুযোগ সুবিধার কারণে আমরা তাঁকে উপযুক্ত পদে নিয়োগ করতে পারছি না। এ কারণেই তিনি তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী একটি ভাল চাকরির খোঁজ করছেন। আমরা সর্বদাই তাঁর মঙ্গল কামনা করি।

আপনার বিশ্বস্ত
এম, রহমান
ম্যানেজিং পার্টনার

৬। ৪ নং পত্রের নিরপেক্ষ উত্তর।

রহমান এন্ড কোং

(স্টেশনারি দ্রব্যাদির খুচরা বিক্রেতা)

৫নং স্টেশন রোড
দিনাজপুর
১২ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮

জেনারেল ম্যানেজার
রয়াল স্টোরস
১৪৫, মৌলভী বাজার
ঢাকা

জনাব,

আপনার ২রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের পত্রখানি পেলাম।

আপনার পত্রে আপনি আমাদের ফার্মের অফিস সহকারী জনাব আহমদ হোসেন প্রমাণিক সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় আমরা এ মুহূর্তে জনাব প্রামাণিক সম্পর্কে ভাল মন্দ কিছুই বলতে পারছি না। তিনি মাত্র ২ মাস পূর্বে আমাদের অফিস সহকারী পদে যোগদান করেছেন। কাজেই এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা কঠিন।

অবশ্য, আপনারা তাঁকে আপনাদের ফার্মে নিয়োগ করলে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। তবে এ ব্যাপারে আমরা কোনরূপ দায়িত্ব নেবো না।

বলা বাহুল্য, আমাদের পত্রের বিষয়বস্তু গোপন রাখলে কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনার বিশ্বস্ত
এম, রহমান
ম্যানেজিং পার্টনার

১২.৩ ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধান পত্র কী (What is Business Letter of Enquiry)

ব্যবসায় জগতে প্রবাদ আছে, 'সততাই সর্বোত্তম নীতি' (Honesty is the best Policy) এই নীতির উপর ভিত্তি করেই অনেকে শূন্য থেকে শুরু করে পৃথিবীর খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

বস্তুত ব্যবসায়ে চিরন্তন সাফল্যের জন্য নীতির বিকল্প নেই। তা সত্ত্বেও সব সমাজেই অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, কালোবাজারি প্রভৃতি অশুভ তৎপরতা চলছে বিরামহীনভাবে। তাই, খাঁটি ব্যবসায়ীরা এরূপ অশুভ দুর্নীতির ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য সদা সতর্ক থাকে।

উৎপাদক বা পণ্য সরবরাহকারী অনেক সময় অচেনা নতুন ক্রেতার কাছ থেকে মালের অর্ডার পায়। এরূপ পরিস্থিতিতে সে মাল প্রেরণের পূর্বে ফরমায়েশ দাতার ঋণ গ্রহণযোগ্যতার খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তার পরিচিত কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট পত্র লিখে থাকে। এ পত্রই হচ্ছে ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধান পত্র। অর্থাৎ পণ্য বিক্রেতারা মাল সরবরাহকারী অচেনা ফরমায়েশ দাতাকে ধারে মাল সরবরাহ দেয়ার পূর্বে তার আর্থিক অবস্থা, সুনাম, সততা ইত্যাদি সংবাদ জানতে চেয়ে ফরমায়েশ দাতার পরিচিত কোন তৃতীয় পক্ষের নিকট যে পত্র লেখে তাকে ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধান বা ব্যবসায়িক যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্র বলে।

১২.৩.১ ব্যবসায়িক তথ্য অনুসন্ধান পত্রের বিষয়বস্তু

ব্যবসায়িক তথ্য অনুসন্ধান পত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকা প্রয়োজন :

১। শুরুতে অনুসন্ধানকারীকে পত্র লেখার কারণ বা উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে হবে।

২। ব্যবসায়িক যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রে ফরমায়েশ দাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা অনুসন্ধান পত্রে পরিষ্কাররূপে উল্লেখ করা উচিত।

৩। ফরমায়েশ দাতা সম্পর্কে কোন কোন তথ্য (যেমন– আর্থিক অবস্থা, সততা, সুনাম ইত্যাদি) পত্র প্রাপকের নিকট থেকে জানতে চাওয়া হচ্ছে তার উল্লেখ এতে থাকতে হবে।

৪। নির্ধারিত মূল্যের পণ্য ধারে ফরমায়েশ দাতাকে সরবরাহ করা কঠিন হবে কিনা সে ব্যাপারে অনুসন্ধানকারী পত্র প্রাপকের পরামর্শ চাবে।

৫। অনুসন্ধানকারী এতে পত্র প্রাপক কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবে।

৬। অনুসন্ধান পত্রের সাথে ডাক টিকিটযুক্ত খাম প্রেরিত হলে লেখক তা অনুসন্ধান পত্রে ব্যক্ত করবে।

৭। ভবিষ্যতে সুযোগ আসলে অনুসন্ধানকারী উত্তরদাতাকে অনুরূপ সেবাদানের আশ্বাস ব্যক্ত করবে।

৮। পত্র প্রাপক সংবাদ দিয়ে যে উপকার সাধন করবে সেজন্য অনুসন্ধানকারী তার পত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

১২.৩.২ ব্যবসায়িক অনুসন্ধান পত্রের উত্তর

ব্যবসায়িক তথ্য অনুসন্ধান পত্রের উত্তর অনুকূল অথবা প্রতিকূল উভয়ই হতে পারে।

অনুকূল উত্তর

ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধান পত্রের উত্তরে উত্তরদাতা জিজ্ঞাসিত ফরমায়েশ দাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সংবাদ পরিবেশন করে যে পত্র রচনা করে তাকে ব্যবসায়িক তথ্যানুসন্ধানের অনুকূল উত্তর বলে।

এ প্রকার পত্রের মাধ্যমে উত্তরদাতা অনুসন্ধানকারীর পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করে, ফরমায়েশ দাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, আর্থিক স্বচ্ছলতা, সততা, সুনাম, ধারে পণ্য সরবরাহের সুপারিশ প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করে।

প্রতিকূল উত্তর

ব্যবসায়িক যোগ্যতা অনুসন্ধান পত্রের প্রতিকূল উত্তর রচনা করা বেশ কঠিন ও বিড়ম্বনাপূর্ণ। এতে উত্তরদাতাকে সুকৌশলে জিজ্ঞাসিত ফরমায়েশ দাতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অসাধুতা প্রভৃতির বর্ণনা প্রদান করতে হয়। এরপর সে পত্রের বিষয়বস্তু গোপন রাখার অনুরোধ রেখে পত্র লেখা শেষ করে।

নমুনা

(ব্যবসায়িক যোগ্যতা বা তথ্যানুসন্ধান পত্র)

১। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অনুসন্ধান।

আহমদ বস্ত্রালয়
১৩৫, ইসলামপুর রোড
ঢাকা

তারিখ : ০৫/০৯/২০০৮ ইং
২১/৫/১৪১৫ বাং

ব্যবস্থাপক
রয়েল ক্লথ স্টোরস
১০৩, নিউ মার্কেট, রাজশাহী

জনাব,

সম্প্রতি নওগাঁ শহরের মেসার্স রবিন ব্রাদার্স আমাদের সাথে ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এবং পরিচয়সূত্র হিসেবে আপনাদের নাম উল্লেখ করেছেন।

অর্ডার দাতা প্রতিষ্ঠানটি আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই, মাল সরবরাহের পূর্বে আমরা তাদের সব রকম তথ্য জানার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী।

অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে মেসার্স রবিন ব্রাদার্স-এর আর্থিক অবস্থা, সততা ও সুনাম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে উপকৃত করবেন। বিশেষত তাদেরকে ১৫ হাজার টাকা মূল্যের মাল বাকিতে সরবরাহ করা ঠিক হবে কিনা সে ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ পেলে আমরা সবিশেষ উপকৃত হব।

আপনাদের সুবিধার্থে এতদসঙ্গে আমাদের ঠিকানা সংবলিত একটি ডাক টিকিটযুক্ত খাম প্রেরণ করলাম।

বলা বাহুল্য, আপনাদের প্রদত্ত সংবাদ সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। ভবিষ্যতে আপনাদের খেদমতে অনুরূপ সেবাদান করার সুযোগ পেলে আমরা কৃতার্থ হব।

আপনার বিশ্বস্ত
জরীফ আহমদ
ব্যবস্থাপনা-অংশীদার

২। ব্যবসায়িক যোগ্যতা অনুসন্ধানের অনুকূল উত্তর (১নং পত্রের অনুকূল উত্তর)।

রয়েল ক্লথ স্টোরস
(সর্ব প্রকার পোশাক ব্যবসায়ী)
১০৩, নিউ মার্কেট, রাজশাহী

তারিখ : ১৬/০৯/২০০৮ইং
১/৬/১৪১৫বাং

মেসার্স আহম্মদ বস্ত্রালয়
১৩৫, ইসলামপুর রোড
ঢাকা

জনাব,

আপনাদের ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের পত্রখানি আজই পেলাম।

আপনাদের পত্রে আপনারা নওগাঁ শহরের মেসার্স রবিন ব্রাদার্স-এর তথ্যাবলি জানতে চেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সাথে ব্যবসায় করে আসছে। আমরা সব সময়ই তাদের কাছ থেকে সন্তোষজনক ব্যবহার পেয়ে আসছি। বাজারে তাঁদের যথেষ্ট ব্যবসায়িক সুনামও রয়েছে। পণ্যের মূল্য পরিশোধে তারা সর্বদা তৎপর।

আপনারা যে পরিমাণ অর্থের কথা উল্লেখ করেছেন তার চেয়েও অনেক বেশি টাকার মাল তাদেরকে নির্দ্বিধায় ধারে সরবরাহ করা যেতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত
এল. আর. সরকার
ব্যবস্থাপক

৩। ব্যবসায়িক যোগ্যতা অনুসন্ধানের প্রতিকূল উত্তর (১নং পত্রের প্রতিকূল **উত্তর)।**

রয়েল কথ স্টোরস

(সর্ব প্রকার পোশাক ব্যবসায়ী)
১০৩, নিউ মার্কেট, রাজশাহী

তারিখ : ১৬/০৯/২০০৮ইং
১/৬/১৪১৫ বাং

মেসার্স আহম্মদ বস্ত্রালয়
১৩৫, ইসলামপুর রোড
ঢাকা

জনাব,

আপনাদের ৫ ই সেপ্টেম্বর, ২০০৮ তারিখের পত্রখানি পেলাম।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাচ্ছি যে, নওগাঁ শহরের মেসার্স রবিন ব্রাদার্স-এর বর্তমান আর্থিক অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। কিছুদিন আগেও এ প্রতিষ্ঠানটির বাজারে যথেষ্ট সুনাম ছিল। কিন্তু গত বছর ফার্মের ব্যবস্থাপনা-অংশীদার জনাব নন্দকুমারের অন্তর্ধানের পর থেকে এর দুর্দিন শুরু হয়েছে। অবশ্য আগের সুনাম পুনরুদ্ধারের জন্য ফার্মের বর্তমান অংশীদাররা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানটিকে নগদে মাল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করার অবকাশ আছে বলে মনে করি।

পরিবেশিত সংবাদ গোপন রাখবেন বলে আশা করি।

আপনার বিশ্বস্ত
এল. আর. সরকার
ব্যবস্থাপক

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অনুসন্ধান পত্র পাওয়ার পর পত্র প্রাপক অনুসন্ধানকারীকে কয় ধরনের উত্তর প্রদান করতে পারেন ?

ক. দুই   খ. তিন
গ. চার   ঘ. পাঁচ

২। নিম্নে অনুসন্ধান পত্রের বিভিন্ন ধরনের উত্তর পত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল –

i. অনুকূল উত্তর পত্রে আবেদনকারীর যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার ভুয়সী প্রশংসা করা হয়
ii. প্রতিকূল উত্তর পত্রে আবেদনকারীর যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার বিপক্ষে বিবৃতি দেয়া হয়
iii. নিরপেক্ষ উত্তর পত্রে আবেদনকারীর যোগ্যতার উচ্চ প্রশংসা কিন্তু নিষ্ঠা ও সততার বিপক্ষে বিবৃতি দেওয়া হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও iii   খ. ii ও iii
গ. i ও ii   ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

চট্টগ্রামের রিয়াজুদ্দিন বাজারের আহমদ বস্ত্রালয়ের কাছে ফেনীর গোলাপ মিয়া মার্কেটের আনোয়ার বস্ত্রালয় বাকিতে কিছু বিশেষ ধরনের কাপড় ক্রয়ের জন্য ফরমায়েশ পত্র পাঠায়। আনোয়ার বস্ত্রালয় আহমদ বস্ত্রালয়ের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়ায় পরিচয়সূত্র হিসেবে আগ্রাবাদ রোডের সবুজ বস্ত্রালয়ের নাম উল্লেখ করায়, আহমদ বস্ত্রালয়ের ব্যবস্থাপক সবুজ বস্ত্রালয়ের ব্যবস্থাপকের কাছে একটি অনুসন্ধান পত্র লিখেন।

৩। উপরোক্ত অনুসন্ধান পত্রকে কোন ধরনের অনুসন্ধান পত্র বলে ?

ক. তথ্য অনুসন্ধান পত্র   খ. ব্যবসায়িক অনুসন্ধান পত্র
গ. ব্যক্তিগত অনুসন্ধান পত্র   ঘ. বাণিজ্যিক অনুসন্ধান পত্র

৪। উপরোক্ত অনুসন্ধান পত্রে ফেনীর আনোয়ার বস্ত্রালয়ের অবস্থান কী ?

ক. ফরমায়েশ দাতা   খ. ফরমায়েশ গ্রহীতা
গ. জিজ্ঞাসিত ফরমায়েশ দাতা   ঘ. অনুসন্ধিৎসু ফরমায়েশ গ্রহীতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব আবুল হোসেন "সবুজ এন্ড কোম্পানি" এর একজন সহকারী হিসাবরক্ষক। ১ বছর হয় তিনি এই কোম্পানিতে যোগদান করেছেন। সততা, দক্ষতা, নিয়মানুবর্তিতা, বুদ্ধিমত্তা এবং অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলি তার ভালই। সম্প্রতি তিনি ঢাকার মতিঝিল এলাকার 'বশির এন্ড কোম্পানি'তে হিসাবরক্ষক পদে চাকরির আবেদন করেছেন। সে সূত্রে বশির এন্ড কোং' এর জেনারেল ম্যানেজার তার সম্পর্কে জানতে চেয়ে 'সবুজ এন্ড কোং' এর নিকট একটি তথ্যানুসন্ধান পত্র প্রেরণ করেছেন।

ক. তথ্য অনুসন্ধান পত্র কী ?
খ. এ ধরনের পত্র লেখা হয় কেন ?
গ. জনাব আবুল হোসেন সম্পর্কে জানতে 'বশির এন্ড কোং'-এর পক্ষে একটি ব্যক্তিগত তথ্যানুসন্ধান পত্র রচনা কর।
ঘ. আবুল হোসেন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান পত্রের অনুকূল উত্তর লেখার সময় কী কী বিষয় বিবেচনা করা যায় বলে তুমি মনে কর ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফরমায়েশ ও অভিযোগ পত্র
Order and Complaint Letters

১৩.১ ফরমায়েশ পত্র কী (What is an Order Letter)

ব্যবসায় জগতে হর-হামেশাই ফরমায়েশ বা অর্ডারের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য কেনা-বেচা হয়ে থাকে। ক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্য প্রেরণের জন্য বিক্রেতা বা সরবরাহকারীর নিকট যে লিখিত নির্দেশ প্রদান করে তাকে ফরমায়েশ পত্র বলে। ক্রেতা বিক্রয় প্রস্তাব, কোটেশন, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য, এগুলোর মূল্য ও বিক্রয় শর্তাদির সংবাদ পেয়ে সরবরাহকারীর নিকট নির্দিষ্ট মালের অর্ডার পেশ করে। সরবরাহকারী ফরমায়েশ অনুযায়ী মাল প্রেরণ করে। সুতরাং ফরমায়েশ পত্র এরূপ এক প্রকার পত্র যার মাধ্যমে ক্রেতা নির্দিষ্ট পণ্যদ্রব্য প্রেরণের জন্য বিক্রেতা বা সরবরাহকারীর নিকট ফরমায়েশ প্রদান করে। এতে মালের বিবরণ, মূল্য, সরবরাহের সময় ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়।

১৩.২ ফরমায়েশ পত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Order Letter)

ফরমায়েশ পত্রের উপরিভাগে ফরমায়েশদাতাকে তার প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়। এরপর যথাস্থানে অভ্যন্তরীণ ঠিকানা লিখে ও তার নিচে সম্বোধনসূচক শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করে তাকে ফরমায়েশ পত্র লেখা শুরু করতে হয়। নিচে এর বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হল :

১। পণ্যের বিবরণ : ফরমায়েশ পত্রে অর্ডারকৃত পণ্য বা পণ্যসমূহের পূর্ণ বর্ণনা দিতে হয়। এতে পণ্যের নাম, ট্রেড মার্ক, রং, সাইজ, পরিমাণ, ওজন প্রভৃতি বিশদভাবে উল্লেখ করতে হয়।

২। পণ্যের মূল্য : ফরমায়েশদাতাকে পত্রে ফরমায়েশী পণ্যের মূল্য উল্লেখ করতে হয়।

৩। মূল্য পরিশোধের উপায় : ফরমায়েশদাতা কীভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করবে তা ফরমায়েশ পত্রে উল্লেখ করতে হয়। ক্রেতা পে-অর্ডার, ডিম্যান্ড ড্রাফট অথবা বিনিময় বিলের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

৪। পণ্য সরবরাহের সময় : কতদিন বা কত তারিখের মধ্যে মাল সরবরাহ করতে হবে তার উল্লেখ ফরমায়েশ পত্রে থাকবে।

৫। পরিবহণ সংক্রান্ত নির্দেশ : সরবরাহকারী কোন পথে মাল প্রেরণ করবে তা তার ফরমায়েশ পত্রে উল্লেখ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো কিছু উল্লেখ না থাকলে সুবিধামত সড়কপথে, নদীপথে, রেলপথে বা বিমানপথে পণ্য প্রেরণ করতে পারে।

৬। বীমা সংক্রান্ত নির্দেশ : পণ্য বীমা করার প্রয়োজন থাকলে ক্রেতাকে ফরমায়েশ পত্রে তা উল্লেখ করতে হবে।

৭। ফরমায়েশ নম্বর : ক্রেতা ফরমায়েশ পত্রে তারিখসহ ফরমায়েশ নম্বর লিখে থাকে। ফরমায়েশ পত্রে নম্বর থাকলে দরকারবশত ভবিষ্যতের যে কোনো সময় সহজেই এর সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

৮। অন্যান্য বিশেষ নির্দেশ : বিশেষভাবে মাল প্যাককরণ, মাল যানবাহনে বোঝাইকালে সতর্কতা অবলম্বন, মাল প্যাক করার পূর্বে চূড়ান্ত পরিদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দেয়ার প্রয়োজন হলে তা অর্ডার পত্রে উল্লেখ করতে হবে।

১৩.৩ ফরমায়েশ পত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয় (Factors to be Considered in Writing an Order Letter)

ফরমায়েশ পত্র ব্যবসায়ের একটি মূল্যবান দলিল। তাই এ পত্র যত্নসহকারে ও সতর্কতার সঙ্গে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে বিক্রেতা কর্তৃক প্রেরিতব্য পণ্যের পূর্ণ বিবরণ (পণ্যের নাম, রং, সাইজ, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদি), পরিবহণ ব্যবস্থা, মাল প্রেরণের সময় প্রভৃতির সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকতে হবে। এটি হবে সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল। দ্ব্যর্থবোধক ভাব ও ভাষার সন্নিবেশ এতে ঘটবে না। এর মাধ্যমে অবশ্যই ফরমায়েশদাতার সৌন্দর্য ও বিনয় প্রকাশ পাবে। ফরমায়েশ পত্রে অবশ্যই পত্র প্রেরক বা ফরমায়েশদাতার স্বাক্ষর থাকতে হবে।

নমুনা

(অর্ডার বা ফরমায়েশ পত্র)

১। ফুটবলের ফরমায়েশ পত্র।

হক স্টোরস

(যাবতীয় ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহকারী)
৭/বি, নিউ রোড
বগুড়া

অর্ডার নং-১৩৭

তারিখ : ০৮ই আগস্ট ২০০৮ ইং
২৪/৪/১৪১৫ বাং

মেসার্স মডার্ণ স্টোরস
১৪৫, স্টেডিয়াম মার্কেট
ঢাকা

জনাব,

আপনাদের ৩০শে জুলাই, ২০০৮ তারিখে লিখিত বিভিন্ন প্রকার ফুটবল বিক্রির প্রস্তাব পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। অনুগ্রহপূর্বক নিম্নোক্ত ফুটবলগুলো সত্বর আমাদের ঠিকানায় প্রেরণ করবেন ঃ

ক্রমিক নং	সংখ্যা	সাইজ / সেপ	মূল্য (প্রতি ডজন)
১।	৪ ডজন	১নং টি-সেপ ফুটবল	৳ ৪,০০০.০০
২।	৩ ডজন	৪নং টি-সেপ ফুটবল	৳ ৭,০০০.০০
৩।	২ ডজন	৫নং টি-সেপ ফুটবল	৳ ৮,০০০.০০

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত দর আপনাদের প্রেরিত মূল্য-তালিকা থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।
আপনার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা মোট মূল্যের উপর শতকরা ৳ ৫.০০ টাকা হারে ডিসকাউন্ট পাবার আশা রাখি।
আশা করি, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মালগুলো দিগন্ত পরিবহণযোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
এ. হক
ম্যানেজার

২। বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের ফরমায়েশ।

আধুনিক বস্ত্র সম্ভার

(বস্ত্র ব্যবসায়ী)

১৫১, সুপার মার্কেট

স্টেশন রোড, বগুড়া

তারিখ : ১৫ই নভেম্বর, ২০০৮

মেসার্স আজিজিয়া বস্ত্র বিতান

১৫২, ইসলামপুর রোড

ঢাকা-১১০০

জনাব,

আপনাদের ৩রা নভেম্বর তারিখের পত্র এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের মূল্য তালিকা পেয়ে আনন্দিত হলাম। অনুগ্রহপূর্বক সোহাগ সাধারণ পরিবহণ লিঃ -এর মারফত নিম্নবর্ণিত মালগুলো আমাদের ঠিকানায় পাঠাবেন :

১। পানামা উল কোটিং	৫ থান	প্রতি থান	৳ ৫০০০.০০ টাকা
২। সেঞ্চুরী সাটিং (ব্লু)	৩ "	"	৳ ৩০০০.০০ টাকা
৩। ষোল হাজার লংক্লথ	৫ "	"	৳ ২৫০০.০০ টাকা
৪। লুঙ্গী (বস্ত্র সম্ভার / (BTMC)	১০০ জোড়া	প্রতি জোড়া	৳ ৩১০.০০ টাকা
৫। মারকিন থান	৬ থান	প্রতি থান	৳ ১০০০.০০ টাকা
৬। ছাপা শাড়ি (BTMC)	৫০০ জোড়া	প্রতি জোড়া	৳ ২৫০.০০ টাকা

আপনাদের মূল্য-তালিকার বর্ণনা মোতাবেক মোট ক্রয় মূল্যের উপর ১০% হারে বাট্টা পাব, আশা করি। অনুগ্রহপূর্বক মালগুলো উত্তমরূপে গাঁইট বেঁধে পাঠাবেন। এ ব্যাপারে আমাদের একটি বিশেষ অনুরোধ, মালগুলো অবশ্যই আগামী ৩ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ঠিকানায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিবেন।

মালগুলো ছাড়করণের পর এক সপ্তাহের মধ্যে সোনালী ব্যাংক থেকে মালের মূল্য বাবদ আপনাদের প্রাপ্য টাকার ডি/ডি সংগ্রহ করে প্রেরণ করব।

আপনাদের বিশ্বস্ত

এম. আর. খান

ব্যবস্থাপক

৩। কাগজের ফরমায়েশ।

প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়
গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা
ফোন : ৫০৭১৯০২

তারিখ : ০৫/০৯/২০০৮ ইং
২১/৫/১৪১৫ বাং

মার্কেটিং ম্যানেজার
কর্ণফুলী পেপার মিল্‌স লিঃ
চন্দ্রঘোনা, চট্টগ্রাম

জনাব,

আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আমাদের স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষা এবং দশম শ্রেণীর টেস্ট পরীক্ষা আরম্ভ হবে। এজন্য আমাদের ৫০০ রিম ৩৬ পাউন্ড ডবল ডিমাই সাইজের সাদা কাগজ প্রয়োজন। খোলা বাজারে কাগজের দর অত্যন্ত বেশি বলে আমাদের পক্ষে বাজার থেকে কাগজ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় ৫০০ রীম ৩৬ পাউন্ড ডবল ডিমাই সাদা কাগজ প্রেরণ করবেন। উল্লেখ্য যে, আপনাদের প্রেরিতব্য কাগজের চালান আগামি নভেম্বর মাসের ১০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই আমাদের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

এ ব্যাপারে আমাদের একটি বিশেষ অনুরোধ, অনুগ্রহপূর্বক মিল রেটে কাগজ সরবরাহ করে শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করবেন।

এতদসঙ্গে কাগজের মূল্য বাবদ আপনাদের পাওনা ৳ ৫০,০০০.০০ টাকা সোনালী ব্যাংকের অ্যাকাউন্টপেয়ী ডি/ডি প্রেরণ করলাম।

অনুগ্রহপূর্বক মালগুলো উত্তমরূপে প্যাক করে নির্ভরযোগ্য প্রথম শ্রেণীর সাধারণ পরিবহণের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন। সত্বর এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার এবং ফরমায়েশ সম্পাদন করে বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. এইচ. খান
প্রধান শিক্ষক
গভঃ ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা

১৩.৪ ফরমায়েশের স্বীকৃতি (Acceptance of Order)

ক্রেতার নিকট থেকে অর্ডার পাওয়ার পর বিক্রেতা উক্ত অর্ডার বা ফরমায়েশের প্রাপ্তিস্বীকার করে যে পত্র লিখে তাকে অর্ডার স্বীকার পত্র বলে। এই পত্র পেলে ক্রেতা নিশ্চিত হতে পারে যে, সে কিছু দিনের মধ্যে মাল পাবে। এ ধরনের পত্র লেখা আজকাল রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। ক্রেতার নিকট থেকে অর্ডার প্রাপ্তি বিক্রেতা ও সরবরাহাকারীর কাছে একটি মহামূল্যবান বিষয়। তাই অর্ডার অবহেলায় না হারিয়ে সে অর্ডার পাওয়ার পর মুহূর্তেই স্বীকৃতি পত্র পাঠিয়ে ক্রেতাকে মাল প্রেরণের আশ্বাস দিয়ে থাকে। ব্যবসায় জগতে এ প্রকার পত্র লেখা একটি শিষ্টাচারও বটে। কোনো কারণে বিক্রেতা মাল প্রেরণে অপারগ হলে তাও ক্রেতাকে জানিয়ে দিতে হবে। এতে উভয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্প্রীতি বাড়বে।

ফরমায়েশ স্বীকার পত্রের নমুনা

৪। ফরমায়েশ পত্র।

মর্ডান স্টোরস

(যাবতীয় ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহকারী)

১৪৫, স্টেডিয়াম মার্কেট, ঢাকা

ফোন : ৫০৭১৯০১

তারিখ : ১২/০৮/২০০৮ ইং
২৮/৪/১৪১৫ বাং

মেসার্স হক স্টোরস
৭/বি, নিউ রোড
বগুড়া

জনাব,

আপনাদের ৮ই আগস্ট তারিখের ১৩৭ নং অর্ডারের জন্য ধন্যবাদ জানবেন। আপনাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আগামী ১৫ই আগস্ট তারিখে ফুটবলগুলো পাঠাবার আশা রাখি। আমরা যে পরম নিষ্ঠা ও সতর্কতার সাথে অর্ডার সম্পাদন করব সে ব্যাপারে আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকবেন।

এটিই আপনাদের সাথে আমাদের প্রথম লেনদেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনাদের সাথে আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন থাকবে।

যথাসময়ে আমরা আপনাদেরকে মাল প্রেরণের সংবাদ দেব। আশা করি আগামীতে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পাব।

আপনার বিশ্বস্ত
এম. রহমান
ম্যানেজার

১৩.৫ চালান পত্র (Invoice Letter)

ফরমায়েশদাতা ক্রেতার নিকট মাল প্রেরণের পর পরই বিক্রেতা ক্রেতাকে মাল প্রেরণের সংবাদ দিয়ে পত্র লিখে থাকে। এরূপ পত্রকে অর্ডার সম্পাদন পত্র বলে। এই পত্র পেয়ে ক্রেতা মাল ছাড়করণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এতে ফরমায়েশের তারিখ, প্রেরিত মালের বিবরণ, মাল প্রেরণের তারিখ, পরিবহণ ব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়।

চালান পত্রের নমুনা

১। চালান পত্র রচনার বিভিন্ন দিক।

মর্ডান স্টোরস

(যাবতীয় ক্রীড়া সামগ্রী সরবরাহকারী)

১৪৫, স্টেডিয়াম মার্কেট, ঢাকা

ফোন : ২৫৭২৫২৬

তারিখ : ১৫ই আগস্ট ২০০৮ ইং
৩১ শ্রাবণ ১৪১৫ বাং

মেসার্স হক স্টোরস্
৭/বি, নিউ রোড, বগুড়া

জনাব,

আপনাদের ৮ই আগস্ট, ২০০৮ তারিখের ১৩৭ নং অর্ডার মোতাবেক আমরা অদ্য দিগন্ত পরিবহণ যোগে নিম্নলিখিত মালগুলো প্রেরণ করলাম ঃ

১। ১নং সাইজের টি-সেপ ফুটবল = ৪ ডজন
২। ৪নং সাইজের টি-সেপ ফুটবল = ৩ ডজন
৩। ৫নং সাইজের টি-সেপ ফুটবল = ২ ডজন

মোট = ৯ ডজন

আপনাদের নিকট মালের মূল্য, আনুষঙ্গিক খরচ (প্যাকিং ও ট্রাকভাড়া) বাবদ আমাদের পাওনা হচ্ছে সর্বমোট ৮ ৪৮,৭০০ টাকা। উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মোট মূল্যের উপর ৫% হারে বাট্টা বাদ দিয়ে এই মূল্য ধার্য করা হয়েছে। এতদসঙ্গে প্রেরিত চালান পত্র দেখে সবকিছু বুঝতে পারবেন। অনুগ্রহপূর্বক সত্বর ডি/ডি পাঠিয়ে উক্ত মূল্য পরিশোধ করলে বাধিত হব।

মোড়ক বাঁধাই করার পূর্ব মুহূর্তে সমুদয় মালই ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। আশা করি, উৎকৃষ্ট মানের মাল পেয়ে আপনারা সন্তুষ্ট হবেন।

আপনাদের অর্ডারের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আশা করি ভবিষ্যতেও আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পেতে থাকব।

আপনাদের বিশ্বস্ত
এম. রহমান
ম্যানেজার

১৩.৬ মাল প্রাপ্তি ও মূল্য পরিশোধ (Receipt of Ordered Goods & Payment)

বিক্রেতা কর্তৃক প্রেরিত পণ্য ক্রেতার ঠিকানায় পৌছলে ক্রেতা পণ্য ছাড় করিয়ে সেগুলোকে ফরমায়েশ পত্র ও চালান পত্রের সাথে মিলিয়ে দেখে। এরপর সে মাল প্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে বিক্রেতার নিকট পত্র প্রেরণ করে। এ ধরনের পত্রকে পণ্য প্রাপ্তির স্বীকৃতি পত্র বলে। এ পত্রের সঙ্গে অথবা এর অব্যবহিত পরেই সে পণ্যের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

নিচের যে কোনো উপায়ে ক্রেতা বিক্রেতাকে মালের মূল্য পরিশোধ করতে পারে।

ক. মাল ছাড়করণ কালে নগদ মূল্য পরিশোধ।

খ. পোস্টাল অর্ডার প্রেরণ।

গ. চেক প্রদান।

ঘ. বিক্রেতা কর্তৃক সম্পাদিত বিলে স্বীকৃতি প্রদান।

ঙ. ব্যাংক ড্রাফ্‌ট প্রেরণ।

নমুনা

৩। মাল প্রাপ্তি ও মূল্য পরিশোধ।

হক স্টোরস্
(ক্রীড়া সামগ্রীর খুচরা বিক্রেতা)
৭/বি, নিউ রোড, বগুড়া
ফোন : ৩২৭৪

তারিখ ঃ ২০শে আগস্ট ২০০৮ ইং
০৫ ভাদ্র ১৪১৫ বাং

মেসার্স মর্ডাণ স্টোরস
১৪৫, স্টেডিয়াম মার্কেট
ঢাকা

জনাব,

আপনাদের প্রেরিত বিভিন্ন সাইজের ৯ ডজন ফুটবলের চালান সময় মত ও সন্তোষজনক অবস্থায় আমাদের নিকট পৌছেছে।

মালের মোট মূল্য সোনালী ব্যাংকের ৳ ৪৮,৭০০.০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট নং-জ. ৫০৭০২৩/৫, তাং ১৯/৮/২০০৮ এতদসঙ্গে আপনাদের নিকট প্রেরণ করলাম।

সময়মত উৎকৃষ্ট মানের মাল প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জানবেন।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করে বাধিত করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
এ. হক
ম্যানেজার

১৩.৭ অভিযোগ পত্র কী (What is a Complaint Letter)

ব্যবসায় জগতে নিয়তই নানারূপ ভুল-ত্রুটি হতে দেখা যায়। এরূপ ভুল-ত্রুটি ঘটার কারণেই ক্রেতা বিক্রেতার নিকট অভিযোগ ও দাবি উত্থাপন করে। যেমন, বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার নিকট প্রেরিত মাল ত্রুটিপূর্ণ, নিম্নমানের বা ওজনে/পরিমাণে কম হলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট অভিযোগ পেশ করে। অভিযোগ ন্যায়-সংগত হলে বিক্রেতাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে। নতুবা বাজারে তার সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। ক্রেতা-বিক্রেতা সুসম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হবে। এমনকি, তাদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা বেঁধে যেতে পারে। এতে উভয় পক্ষেরই বিপুল ক্ষতি হবে।

সুতরাং, বিক্রেতার প্রেরিত পণ্য নষ্ট, ত্রুটিপূর্ণ বা নিকৃষ্ট মানের হলে, পণ্য পরিমাণে বা ওজনে কম হলে অথবা প্রেরিত পণ্য অর্ডার বা নমুনা অনুযায়ী না হলে পণ্য প্রাপক বা ক্রেতা পণ্যের ত্রুটি বা বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করে এবং প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে যে পত্র লিখে তাকে অভিযোগ পত্র বলে। এতে পণ্যের প্রাপ্তি সংবাদ, মালের ত্রুটি, ক্ষতির পরিমাণ, ন্যায়-সংগত ক্ষতিপূরণ দাবি ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

১৩.৮ অভিযোগ পত্রের বিষয়বস্তু (Contents of Complaint Letter)

ক্রেতা অভিযোগ পত্রের উপরিভাগে তার প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি এবং প্রাপকের ঠিকানার স্থলে বিক্রেতা বা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও তার নিচে সম্বোধনসূচক শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করে বিষয়বস্তু লেখা শুরু করে।

অভিযোগ পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক :

১। বিক্রেতা কর্তৃক প্রেরিত পণ্যের প্রাপ্তিস্বীকার।
২। ত্রুটির বর্ণনা প্রদান। এ পর্যায়ে পণ্য ক্ষতিগ্রস্থ বা বিনষ্ট বা নিম্নমান বা পরিমাণে কম হলে তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে হবে।
৩। ত্রুটির সম্ভাব্য বা প্রকৃত কারণ বর্ণনা।
৪। ত্রুটির ফলে সংঘটিত ক্ষতির পরিমাণ উল্লেখ।
৫। প্রয়োজনবোধে ন্যায়-সংগত ক্ষতিপূরণ দাবি।
৬। ক্ষতি নিরসনে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ।
৭। ভবিষ্যতে যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বনের অনুরোধ।

বিষয়বস্তুর শেষে বিদায় অভিনন্দনসূচক শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করে ক্রেতাকে এতে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

১৩.৯ অভিযোগ পত্র রচনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ (Factors to be considered writing complaint Letter)

অভিযোগ পত্র রচনায় ক্রেতাকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অভিযোগ পত্র এরূপ রচনা করতে হবে যেন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যকার সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত না হয়।

অভিযোগ পত্রের ভাষা হবে সহজ, সরল, ভাব হবে সুস্পষ্ট। এতে ক্রেতার বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ ঘটতে হবে। পত্র লেখক বা ক্রেতা এর মাধ্যমে বিক্রেতার প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত করবে না বা কটু ভাষা ব্যবহার করবে না। পত্রে পণ্য বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে আভাষ দেয়া যেতে পারে। অভিযোগ পত্রের মাধ্যমে উত্থাপিত দাবি অবশ্যই ন্যায়-সংগত হতে হবে।

১৩.১০ অভিযোগের কারণসমূহ (Reasons for Complain)

ফরমায়েশ পত্র বা অর্ডার পাওয়ার পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য প্রেরণ করে। মাল প্রাপ্তির পর পণ্যে কোনোরূপ ত্রুটি বা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তা নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট কারণ উল্লেখপূর্বক অভিযোগপত্র প্রেরণ করে।

সাধারণত নিচে বর্ণিত যে কোনো কারণে ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট অভিযোগ পত্র লিখে থাকে :

১। বিক্রেতার প্রেরিত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ বা নষ্ট হলে

২। প্রেরিত পণ্য অর্ডারকৃত পণ্যের চেয়ে নিম্নমানের হলে

৩। ক্রেতা কর্তৃক প্রাপ্ত পণ্যের ওজন কম হলে

৪। পণ্য প্রেরণে বিলম্ব হলে

৫। পরিবহণ কালে পণ্য নষ্ট বা পচে গেলে

৬। পরিবহণ কালে পণ্যের কিছু অংশ চুরি গেলে

৭। বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের অধিক দাম ধার্য করা হলে

৮। বিক্রেতা প্রতিশ্রুত বাট্টা মঞ্জুর না করলে

৯। বিক্রেতা ভুলবশত অন্য পণ্য প্রেরণ করলে

১০। বিক্রেতার দোকানের সেলসম্যান ক্রেতার সাথে অশোভন আচরণ করলে

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও অন্য যে কোনো ন্যায় সংগত ত্রুটি বা বিচ্যুতির কারণেও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট অভিযোগ পত্র প্রেরণ করতে পারে।

১৩.১১ মীমাংসা পত্র (Letter of Settlement)

অভিযোগ পত্রের উত্তরে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যাপারে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট যে পত্র লিখে তাকে মীমাংসা পত্র বলে। এটি বিক্রেতার নিকট একটি সুযোগও বটে, কারণ এর মাধ্যমে অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা করে বিক্রেতা ক্রেতার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারে। বিক্রেতা মীমাংসা পত্রের মাধ্যমে ক্রেতার সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম হয়। বাজারে তার সুনাম বৃদ্ধি পায়। এতে অভিযোগ পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার, ক্রেতার ক্ষতির জন্য দুঃখ প্রকাশ, ত্রুটি বা বিচ্যুতি ঘটার বা মাল বিনষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা, ত্রুটি প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস, ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দেয়ার জন্য ক্রেতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ থাকে। অভিযোগ ন্যায়-সংগত না হলে বিক্রেতাকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ও সুকৌশলে তা এড়িয়ে যেতে হবে।

নমুনা

(অভিযোগ ও মীমাংসা পত্র)

১। ত্রুটিযুক্ত বা বিনষ্ট পণ্যের জন্য অভিযোগ ও দাবি।

নবারুন ট্রেডার্স
(বিস্কুট জাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রেতা)
১৫২, বাবু খান রোড, খুলনা

তারিখ : ১২ই ডিসেম্বর, ২০০৮ইং
২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ বাং

মেসার্স হক ট্রেডার্স
১৯, মৌলভী বাজার, ঢাকা

জনাব,

আমাদের ২রা ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের বি-১৭ সংখ্যক অর্ডার অনুযায়ী আমরা আপনাদের প্রেরিত ৮০ টিন বিস্কুটের চালান পেলাম।

কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বিস্কুটগুলোর মধ্যে ১০ টিন বিস্কুট নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো থেকে এক ধরনের পঁচা গন্ধ বের হচ্ছে। আমাদের একজন খরিদ্দার আজকে ৩ টিন বিস্কুট ফেরত দিয়ে গেছেন। টিনে ছিদ্র থাকার কারণেই সম্ভবত এগুলো নষ্ট হয়েছে।

এমতাবস্থায় আমরা ১০ টিন বিস্কুটের মূল্য বাবদ মোট ৳ ১০০০ টাকা ফেরত পাওয়ার দাবি রাখি। এত বেশি ক্ষতি আমাদের পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয় বলে আপনাদের উক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এরূপ দুঃখজনক ঘটনা ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটেনি এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। বিস্কুটের টিনগুলো এ অবস্থায় আমাদের গুদামে জমা রাখা হলো। আপনাদের পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অমল কান্তি সেন
ব্যবস্থাপনা-অংশীদার

২। নিম্নমানের পণ্যের জন্য অভিযোগ।

রাজশাহী জেনারেল স্টোরস্
(মনিহারি দ্রব্যাদি বিক্রেতা)
৪২, রাণী বাজার, রাজশাহী
ফোন : ৪২৬৭

তারিখ : ২৫শে নভেম্বর, ২০০৮ইং
১১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ বাং

মেসার্স কামাল সোপ ওয়ার্কস
১৭২, তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা

জনাব,

আমাদের ১৫ই নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের এফ-৪২ সংখ্যক ফরমায়েশের পরিপ্রেক্ষিতে আপনাদের ৫০ ডজন সাবানের চালান আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

মালগুলো খুলে আমরা নমুনার সাথে মিলিয়ে দেখলাম। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, এ সাবানগুলো আপনাদের প্রেরিত নমুনার চেয়ে নিকৃষ্ট মানের। কয়েক দিন আগে আমরা বাজারে সামান্য সাবান ছেড়েছি। কিন্তু ইতোমধ্যেই খরিদ্দাররা সাবানের মানের ব্যাপারে ঘোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কেউ কেউ কিছু সাবান ফেরতও দিয়েছেন। এ অবস্থায় আমরা বাকি সাবান বাজারে না ছেড়ে আমাদের গুদামে জমা রেখেছি। কারণ, এগুলো বাজারে ছাড়লে আমাদের সুনামের ক্ষতি হতে পারে এবং একই সঙ্গে এর কুফল আপনাদেরকেও ভোগ করতে হতে পারে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাদের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি। আপনাদের নিদের্শ পেলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হব।

আশা করি, সত্বর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিবেন। আপনাদের সাথে আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক চির অটুট থাকবে বলে বিশ্বাস করি।

আপনাদের বিশ্বস্ত
আহমদ শরীফ
রাজশাহী জেনারেল স্টোরস

৩। মাল সরবরাহে বিলম্বের জন্য অভিযোগ।

প্রধান শিক্ষকের কার্যালয়
রংপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর
ফোন : ২৩৭২

তারিখ : ২রা নভেম্বর, ২০০৮ ইং
১৮, কার্তিক ১৪১৫ বাং

মেসার্স ঢাকা পেপার হাউস
১৪২, নয়া বাজার
ঢাকা

জনাব,

আমাদের ৫ই অক্টোবর, ২০০৮ তারিখের পি-৫২ নং পত্রে আপনাদের নিকট ১০০ রিম ডবল ডিমাই সাইজের সাদা কাগজের অর্ডার দিয়েছিলাম। আমরা যথাসময়ে আপনাদের কাছ থেকে অর্ডার প্রাপ্তিস্বীকার পত্রও পেয়েছি। তাতে আপনারা অক্টোবর মাসের ২০ তারিখের মধ্যে মাল প্রেরণের কথা উল্লেখ করেন।

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এ পর্যন্ত আমাদের নিকট পণ্যের চালান এসে পৌঁছেনি। এ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে আমাদের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। কাজেই কাগজগুলো অতি সত্বর আমাদের নিকট পৌঁছানো দরকার। আশা করি জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন, নতুবা আমরা বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হব।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কথা ঘোষণা করছি যে, ২০শে নভেম্বর, ২০০৮ তারিখের পরে আমাদের ঠিকানায় কাগজ পৌঁছলে আমরা তা ছাড় না করিয়ে পুনরায় আপনাদের নিকট ফেরত পাঠাতে বাধ্য হব।

আশা করি অতি সত্বর মাল প্রেরণের ব্যবস্থা নেবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত
আব্দুল হামিদ
প্রধান শিক্ষক

৪। মালের ওজন কম হওয়ার জন্য অভিযোগ।

মজিদ এন্ড সন্স
(সুতা বিক্রেতা ও সরবরাহকারী)
শাহজাদপুর, পাবনা
ফোন : ২৫৩২

তারিখ : ২রা জানুয়ারি, ২০০৮ইং
১৯ পৌষ, ১৪১৫ বাং

মেসার্স আহমদ এন্ড কোং
২২, মিরপুর রোড
ঢাকা

জনাব,

আমাদের বিগত ২০/১২/২০০৮ তারিখের বি/২৮ নং ফরমায়েশ অনুযায়ী প্রেরিত সুতা আমাদের হস্তগত হয়েছে। আপনাদের সুতার মান উন্নত দেখে আমরা খুবই আনন্দিত। সত্বর ফরমায়েশ অনুযায়ী মাল প্রেরণের জন্য আমরা আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আপনাদের প্রেরিত সুতার ওজন সর্বমোট ২০ কেজি কম হয়েছে। তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে মাল প্যাক করার ফলেই বুঝি এরূপ ভুল হয়েছে।

এত বেশি ক্ষতি উপেক্ষা করা কি সম্ভব? আপনারা অনুগ্রহপূর্বক ক্ষতিপূরণ বাবদ ৳ ১৫০০.০০ টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন আশা করি।

আপনাদের বিশ্বস্ত
এম. এ. মজিদ
মজিদ এন্ড সন্স-এর পক্ষে

৫। ঔষধের চালান ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পৌঁছার জন্য রেল কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ।

শাহজালাল মেডিকেল স্টোরস্
১২, শাহজালাল রোড, সিলেট
ফোন : ৪২৬৭

তারিখ : ২০শে ডিসেম্বর ,২০০৮ ইং
০৬ পৌষ, ১৪১৫ বাং

চীফ কমার্শিয়াল অফিসার
বাংলাদেশ রেলওয়ে
রেল ভবন, চট্টগ্রাম

বিষয় : পরিবহণকালে বিনষ্ট পণ্যের ক্ষতিপূরণ দাবি প্রসঙ্গে।

জনাব,

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, গত ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে আমাদের নামে প্রেরিত পাঁচ বাক্সের একটি ঔষধের চালান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ঢাকার কমলাপুর স্টেশন থেকে আমাদের সিলেট স্টেশন পৌঁছেছে। উক্ত চালানের রেল-রসিদ নম্বর বি-১৮০৯, তারিখ ১৫/১২/২০০৮। প্রাপ্ত চালানের মধ্যে দু'টি ঔষধের বাক্স সম্পূর্ণ ভাংগা অবস্থায় পাওয়া যায়। বিষয়টি আমি সঙ্গে সঙ্গেই সিলেট স্টেশন মাস্টার মহোদয়ের নির্দেশক্রমে ট্রাফিক অফিসারকে অবহিত করি। স্টেশন মাস্টার মহোদয়ের নির্দেশক্রমে ট্রাফিক অফিসার বিনষ্ট ঔষধের একটি নোট তৈরি করেন যার একটি কপি এ সঙ্গে আপনার বিবেচনার জন্য প্রেরণ করলাম।

উল্লেখ্য যে, আমাদের ঔষধ সরবরাহকারী মেসার্স আহমদ ঔষধালয়, মিটফোর্ড রোড, ঢাকা আমাদের নির্দেশ মত কাঠের বাক্সে অত্যন্ত মজবুতভাবে মালগুলো প্যাক করে প্রেরণ করেন। তাছাড়া, বাক্সের উপরিভাগে ও চারপাশে Glass with care লেবেল উত্তমরূপে আঁটা ছিল। এতে প্রমাণ হয় যে, পরিবহণকালে রেলকর্মীদের অবহেলা ও অসাবধানতাজনিত নাড়াচাড়ার কারণে মালগুলো নষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য, পণ্যের চালান রেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে প্রেরিত হয়।

এ পত্রের সঙ্গে বিনষ্ট ঔষধের বিবরণ ও চালান পত্রের অনুলিপি প্রেরিত হল। এ থেকে বুঝতে পারবেন, আমাদের ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳ ১২,৩৭০.০০ টাকা। আমরা রেল কর্তৃপক্ষের নিকট এ ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক সত্বর ক্ষতিপূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাধিত হব।

আপনাদের বিশ্বস্ত
আবুল কালাম চৌধুরী
প্রোপাইটার, শাহজালাল মেডিকেল স্টোরস

৬। মীমাংসা পত্র (১ নং পত্রের অনুকূল উত্তর)।

হক ট্রেডার্স
(বিভিন্ন প্রকার হক বিস্কুটের বিক্রয় প্রতিনিধি)
১৯, মৌলভী বাজার, ঢাকা
ফোন : ৫০৪৫৬৭

তারিখ : ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৮ইং
০৪ পৌষ, ১৪১৫ বাং

মেসার্স নবারুণ স্টোরস
১৫২, বাবু খান রোড
খুলনা

জনাব,

আপনাদের ১২ই ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের পত্রের জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের অর্ডার অনুযায়ী প্রেরিত ৮০ টিন বিস্কুটের মধ্যে ১০ টিন বিস্কুট বিনষ্ট অবস্থায় আপনাদের নিকট পৌঁছেছে জেনে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। এ ধরনের ভুল আমাদের ইতোপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। তাড়াহুড়া করে পণ্য টিনজাত করতে গিয়েই বোধ হয় এ ধরনের ভুল হয়েছে।

বলা বাহুল্য, বিনষ্ট বিস্কুটগুলো বাজারে না ছেড়ে ফেলে দিলে উপকৃত হব। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ভুল না ঘটে সে জন্য আমরা সদা সতর্ক থাকব। আশা করি পূর্বের ন্যায় ভবিষ্যতেও আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা পাবো।

আপনাদের বিশ্বস্ত
এম. হক
ম্যানেজার

৭। মীমাংস পত্র (২ নং পত্রের উত্তর)।

কামাল সোপ ওয়ার্কস

(সাবান প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী)

১৭২, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

ফোন : ২৪৫১

টেলিগ্রাম : সোপওয়ার্কস

তারিখ : ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৮ ইং
১১ পৌষ, ১৪১৫ বাং

মেসার্স রাজশাহী জেনারেল স্টোরস
রাণী বাজার
রাজশাহী

জনাব/মহাশয়,

আপনাদের ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ জানবেন। ভুলক্রমে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের সাবান আপনাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে বলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত। এটা অপর একজন খরিদ্দারের অর্ডার ছিল। প্যাকিং ও ডিসপ্যাচিং বিভাগের অসাবধানতার কারণেই এ ধরনের ভুল হয়েছে।

আপনাদের এ পত্রটি প্রপ্তির পূর্বেই বিষয়টি আমাদের গোচরে এসেছে। তদনুসারে আমরা ফরমায়েশ অনুযায়ী উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সাবান আপনাদের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আপনাদের ঠিকানায় মাল প্রেরণ করা হবে।

ইতোপূর্বে প্রেরিত সাবানগুলো অনুগ্রহপূর্বক ফেরত পাঠাবেন। এজন্য পরিবহণ ব্যয় আমরাই বহন করব।

এ ধরনের অনভিপ্রেত ও আকস্মিক ভুলের জন্য আমরা অনুতপ্ত। আশা করি ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি হবে না। আমাদের সুনামের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাবানগুলো বাজারে ছাড়া বন্ধ রেখেছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমরা পূর্বের ন্যায় আপনাদের সহযোগিতা পাবো বলে বিশ্বাস করি।

আনাদের বিশ্বস্ত
মোস্তফা কামাল
ব্যবস্থাপনা- অংশীদার

চালান পত্রের বিভিন্ন দিক
Various Aspects of Invoice Letter

ফরমায়েশকৃত মাল প্রেরণের সংবাদ দিয়ে বিক্রেতা ক্রেতাকে বা ফরমায়েশদাতাকে যে পত্র দিয়ে থাকে তাকে চালান পত্র বলে। এ পত্র রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে।

১। চালান পত্র রচনার সময় ফরমায়েশদাতার সঙ্গে অব্যাহত ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে।

২। এ পত্রে ফরমায়েশ দেয়ার জন্য ফরমায়েশদাতাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে ও ভবিষ্যতে আরও ফরমায়েশ দেয়ার আহবান জানাতে হবে।

৩। এ পত্রে ফরমায়েশ দেয়ার তারিখ, প্রেরিত মালের বিবরণ, মোট মূল্য, প্রদত্ত বাট্টা বা কমিশনের পরিমাণ, মাল প্রেরণের তারিখ, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিশেষ প্যাকিং থাকলে তার বিবরণ থাকতে হবে।

৪। প্রেরিত মালের গুণাগুণ সম্পর্কে বিবরণ দিয়ে মানের উৎকর্ষতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৫। সবশেষে আবার ধন্যবাদ দিতে হবে ও উপযুক্ত শুভেচ্ছা দিয়ে পত্র শেষ করতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মূল্য পরিশোধের উপায় লেখা থাকে কোন পত্রে ?

ক. চালান পত্রে খ. আবেদন পত্রে
গ. ফরমায়েশ পত্রে ঘ. অভিযোগ পত্রে

২। ফরমায়েশ পত্রে অবশ্যই স্বাক্ষর থাকতে হবে –

i. পত্র প্রাপকের ii. পত্র প্রেরকের
iii. পত্র বাহকের

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

৩। ক্রেতা বিক্রেতাকে মালের মূল্য পরিশোধ করতে পারে –

i. চেক প্রদান ও পোস্টাল অর্ডার প্রেরণ করে
ii. ব্যাংক ড্রাফ্ট প্রেরণ করে
iii. নগদ মূল্য পরিশোধ করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

জনাব কাশেম কক্সবাজার বার্মিজ মার্কেটের একজন শুঁটকি বিক্রেতা। তার কাছে ক্রেতার নিকট থেকে অর্ডার প্রাপ্তি একটি মূল্যবান বিষয়। তাই অর্ডার পাওয়ার পর পরই তিনি ক্রেতার নিকট স্বীকৃতি পত্র পাঠান অন্যথায় মাল প্রেরণে অপারগতা জানিয়ে দেন।

৪। ফরমায়েশের স্বীকৃতি পত্র সম্পর্কে নিচের কোনটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত –

ক. এটিতে মালের বিবরণ থাকে
খ. এটির মাধ্যমে মাল প্রদান করা হয়
গ. ক্রেতা মাল প্রাপ্তি সম্পর্কে জানতে পারে
ঘ. এটির মাধ্যমে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন

দামাই টি গার্ডেন, মৌলভী বাজার, এর ম্যানেজারের নিকট ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার মেসার্স রাজ টি গ্যালারির ম্যানেজার নমুনা উল্লেখ করে ২০ কার্টুন চা চেয়ে গত ২০-০২-০৮ইং তারিখে একটি ফরমায়েশ পত্র দেন। পত্রে ২০-০৩-০৮ইং তারিখের মধ্যে নমুনা অনুযায়ী ট্রাকযোগে প্যাকেটজাত করে চা প্রেরণের জন্য বলা হয়। মালামাল পাওয়ার পর দেখা যায় ২ কার্টুন চা নষ্ট হয়ে গেছে। টিনে ছিদ্র থাকার কারণে নষ্ট হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ ঘটনা না ঘটে তার অনুরোধ করে ২ কার্টুন নষ্ট চা বাবদ ৳ ১০,০০০ টাকা ফেরত চেয়ে দামাই টি গার্ডেন মৌলভী বাজার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

ক. ফরমায়েশ পত্র কী ?
খ. ফরমায়েশ পত্রের নমুনায় কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হয় ?
গ. নষ্ট চা এর বিষয় উল্লেখ করে একটি অভিযোগ পত্র রচনা কর।
ঘ. এই প্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কী কী কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

---- ঃ সমাপ্ত ঃ ----

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বুদ্ধিহীনের কাছ থেকে
পরামর্শ না নেওয়াই ভাল

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য